হাকিমুল উম্মত, কুতুবে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, পীর মুরশেদ হযরত
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) প্রণীত

ইছলাহুর রুসূম

(কুসংস্কার সংশোধন)

অনুবাদ
মাওলানা সিরাজুল হক

সম্পাদনায়
মাওলানা সৈয়দ ফওয়াদ আল জওয়াদ

হক লাইব্রেরী
১৮ নং আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা–১০০০

দারুল কুরআন
৩ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা–১০০০

বলা বাহুল্য তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল বিশিষ্ট আলেম সৈয়দ ফওয়াদ আল জওয়াদ অনুবাদলিপিটি সম্পাদনা করে আমাকে যে সাহায্য করেছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে চির ঋণী। এ ছাড়া দেশের প্রচার বহুল প্রসিদ্ধ ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক মদীনা'-এর সম্পাদক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপি প্রদান করে বইটিকে আরো অলংকৃত করেছেন, সেজন্য বিশেষ ভাবে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা জানাই মহান স্রষ্টার দরবারে যিনি আমাকে এ মহৎকাজের তৌফিক দান করেছেন। দোয়া করি তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন এবং ইসলামী প্রচার-প্রসারের সেবায় সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেন।

আমার এ যাত্রালগ্নে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অতএব কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই জ্ঞান গুণী পাঠক সমাজের প্রতি অনুরোধ রইলো যে, বই-এর কোথাও কোন ভুল-ভ্রান্তি চোখে পড়লে কিংবা আপনাদের কোন সুচিন্তিত মতামত থাকলে তা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন সংযোজন ও বিয়োজন করার চেষ্টা করবো।

এ বইয়ের বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে জনাব মাওলানা মুনীর আহমদ সাহেব, মালিক, হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্য তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ। আল্লাহ তাঁর এ খেদমত কবুল করুন এবং প্রয়াসটিকে সফলতা দান করুন।

আরজ গুজার

(মাওলানা) সিরাজুল হক

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَخْرَجَنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَسُوْلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِيْ اِلٰى مَا يُوْجِبُ السُّرُوْرَ وَالْحُبُوْرَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ نَشَرُوا الْحَقَّ بِطَبْعِهِمُ الْمَشْكُوْرِ

এ যুগের অধিকাংশ মুসলমানদের দেখা যাচ্ছে যে, তারা তাদেরই সৃষ্ট বদ-রেওয়াজসমূহকে এত বেশী গুরুত্ব প্রদান করছে, ফরয, ওয়াজিব কাজা হয়ে গেলেও কোন দুঃখ প্রকাশ করে না কিন্তু এ রেওয়ায পালন ক্ষেত্রে তিল পরিমাণও অপূরণ থাকতে পারবে না। যার দরুন নানা ধরনের কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন। শুধু তা নয়, ইহকাল-পরকাল উভয়কেই তারা হারিয়ে বসেন। আর উহা সাধারণভাবে প্রচলন হওয়ায় এর অপকারিতাও নগন্য মনে করে থাকেন। এমনকি কোন কোন রেওয়াজ কারও নিকট শুধু ভাল, তাই নয় বরং উহা ছওয়াবেরই কাজ। আর এ কারণে তারা উপদেশদাতাদের অনর্থক বিরোধিতার মাধ্যমে এর সন্দেহ ভোজন ও অপব্যাখ্যা করে তারা নিজের আমলকে সঠিক মনে করেন। কোন কোন কুসংস্কারকে বিশ্বাসগতভাবে পাপ জানলেও কার্যত তাকে ক্ষুদ্র এবং তা পালনের জন্য নিজকে অপারগ বুঝেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়াজকে একেবারে বৈধ-হালাল সাব্যস্ত করেন। এর চেয়েও বড় বিস্ময়কর যে, কোন কোনটাকে এবাদতই বানিয়ে ফেলেন। আনন্দ, খুশী বা দুঃখকষ্ট প্রকাশের সময় বর্তমানের বেশীর ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী দেখাদেখি মনগড়া রেওয়াজের পালনে এত বেশী যত্নবান হয়ে পড়েছেন, ফরয ও ওয়াজিব বাদ পড়লে কিছু আসে যায় না কিন্তু তার

রেওয়াজটি নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়িত হতে হবে। যা তার জন্য ইহজগতের ক্ষতি ও পরকালের ব্যর্থতা ডেকে আনে। তাই এসব ব্যাপারে সকল মুসলমানগণকে অবগত করা অত্যাবশ্যকীয় ও ঈমানী দায়িত্ব।

সুতরাং সাধারণ উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে বহু প্রচলিত রেওয়াজের অধ্যায় আকারে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন বোধ করছি এবং উপরোক্ত ত্রিপ্রকার ভেদ অনুসারে পুস্তকটি তিন অধ্যায় বিশিষ্ট করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম প্রকারের দোষ যেহেতু সচরাচর ও উজ্জ্বল। দ্বিতীয় প্রকার তারচেয়েও বেশী, তৃতীয় প্রকারের দোষ আরও অধিক আলোচ্যের বিষয়। যেহেতু সাধারণ বিষয়ের আলোচনা জটিলের পূর্বে করা উচিত সেহেতু অধ্যায়সমূহ সে ক্রমানুসারে রাখা হয়েছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু রকমের এমন কুসংস্কারের প্রচলন যেখানে সেখানে বিরাজমান। যা বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সকলেরই জানা। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও এসব দোষের কিছু না কিছু আভাস রয়েছে তাই সবগুলোর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানীলোকের স্বল্প চিন্তাই বোধগম্যতার জন্য যথেষ্ট।

"ইছলাহুর রুসম' দ্বারা এর নাম রেখে
শুরু করছি জ্ঞানদাতার উপর ভরসা রেখে।"

(হাকীমুল উম্মত)
মুহাম্মদ আশরাফ আলী
(আলাইহির রহমাহ)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

আমাদের সমাজে এমন অনেক কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যেগুলোর অপকারিতা ও অবৈধতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাই নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ করা বা তা থেকে বিরত থাকার কোন সুপ্রয়াস দেখা যায় না। বিয়ের অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতের আসর করা এমনি ধরনের একটি রেওয়াজ। এই অবাঞ্ছিত রীতি সমাজদেহের যেসব অপকার সাধন করে সেসবের প্রতি লক্ষ্য করলে সর্বপ্রথমেই যে বিষয়টির প্রতি নজর পড়ে তা হচ্ছে যেনা-ব্যভিচারের ব্যাপক প্রসার। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরুষ লোকেরা পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে চোখের ব্যভিচার করে, তাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে কানের ব্যভিচার করে, তাদের সাথে কথাবার্তা বলে জিহ্বার ব্যভিচার করে, তাদের প্রতি হৃদয়ে দুর্বলতা অনুভব করে মানসিক ব্যভিচার করে, বেহায়া নারীর দেহে হাত লাগিয়ে হাতের ব্যভিচার করে। হাদীস শরীফে এ বক্তব্যের সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূল (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি একস্থানে গিয়ে দেখলাম অগণিত নগ্ন নর-নারী একটা গুহার ভিতরে যন্ত্রণাময় আযাবে লিপ্ত রয়েছে। চুলার ন্যায় প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ ও অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত এ গুহায় আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। আগুনের লেলিহান শিখার সাথে সাথে লোকগুলিও একবার উপরে একবার নীচে উঠানামা করছিল। তাদের অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইলে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা দুনিয়াতে ব্যভিচার করেছে। বায়হাকীতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেন, কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারীর ওপর খোদার অভিশাপ। আর যার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় সে যখন নিক্ষেপকারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তার ওপরও খোদার অভিশাপ।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে কেউ কারো প্রতি কুদৃষ্টি দেবে, কিয়ামতে তার চোখে গলিত সীসা ঢালা হবে।

দ্বিতীয়তঃ নাচ–গানের আসরে উপরোক্ত গোনাহসমূহ প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। যে কোন গোনাহ গোপনে করার চেয়ে প্রকাশ্যে করা অধিকতর দোষণীয়। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে আছে, রসূল (সাঃ) কিয়ামতের পূর্বাভাসের বর্ণনায় বলেছেন, যখন গান–বাজনাকারীদের প্রকাশ্য বিচরণ শুরু হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে লু হওয়া, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, আকৃতির বিকৃতি, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির মত কিয়ামতের অন্যান্য বড় বড় আলামতসমূহও ছিড়ে যাওয়া তসবীহ থেকে দানা পতনের ন্যায় একের পর এক সংঘটিত হতে থাকবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই হাদীসে কিয়ামতের পূর্বে গান–বাজনার ব্যাপক প্রসারের ভবিষ্যদ্বাণী করে বেপরোয়া সঙ্গীতানুরাগীদেরকে এসব সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদানের কঠোর পরিণতি থেকে সতর্ক করা হচ্ছে। ইবনে মাজাহতে আছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, যখনই কোন জাতি প্রকাশ্য বেহায়াপনা ও জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখনই তাদের মধ্যে এমন ধরণের মহামারি ছড়িয়ে পড়ে যা ইতিপূর্বে কোন জাতিতে আসেনি। সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করার চেয়ে অধিক বেহায়াপনা আর কি আছে? আর বিশ্বে নিত্য–নতুন যেসব রোগের উদ্ভব ঘটে চলেছে তা যে আমাদের জঘন্য পাপেরই ফলশ্রুতি—এতে তো কোনই সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ যাদেরে এসমস্ত আসরে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে তাদের সবার একত্রে যেই পরিমাণ পাপ হবে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারও সেই পরিমাণ পাপ হবে। বরং তার অনুসরণে অন্য যেসব লোক এ ধরণের পাপানুষ্ঠানের আয়োজন করবে তাদের পাপেও সে অংশীদার হবে। এমন কি তার মৃত্যুর পর যতদিন পর্যন্ত এ প্রথা চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার আমলনামায় পাপবৃদ্ধির ধারাও অব্যাহত থাকবে। সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "সৎপথে আহ্বানকারী তাঁর অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়ার পাবে অথচ অনুসারীদের সওয়াব হ্রাস প্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে মন্দ পথে আহ্বানকারী তার অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, কিন্তু তাদের পাপ হ্রাস করা হবে না।"

চতুর্থতঃ বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দূর–দূরান্তে অবস্থানকারী আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবকে চিঠি–পত্রের মাধ্যমে এ সমস্ত অপকীর্তির সংবাদ দান করাও মস্তবড় পাপ। রসূল (সাঃ) বলেছেন, "সব পাপই ক্ষমার যোগ্য, তবে যারা প্রকাশ্যে পাপ করে তাদের কথা ভিন্ন।" এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার যথেষ্ট আশা থাকা সত্ত্বেও নিজেই নিজের গোপন পাপের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জঘন্য অপরাধ করা হয়। বলা বাহুল্য, ইদানিং বিয়ের দাওয়াত পত্রে গানের আসরে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোও একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

পঞ্চমতঃ এসব আসরে এমন বাদ্যযন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয় যেগুলির সৃষ্টিই পাপ। গোনাহ ছাড়া অন্য কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয় না। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আমার প্রভু আমাকে তবলা ও বাঁশীর উচ্ছেদ সাধন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।' স্বয়ং রসূলে খোদা (সাঃ) যেই বস্তু উচ্ছেদ করতে আদিষ্ট হয়েছেন, সেই বস্তুকে ব্যবহারকারীর পাপের কি গতি হবে, ভেবে দেখেছেন?

ষষ্ঠতঃ আসরে যোগদানকারীদের নামায তো শিকোয় উঠেই উপরন্তু তাদের গানের শব্দে পাড়া–প্রতিবেশীর নামাযেও ব্যাঘাত ঘটে থাকে। গানের আওয়াজে অনেকেরই সময়মত ঘুম না হওয়ায় নামায কাযা হয়ে থাকে। নামায নষ্ট হওয়ার পাপের বোঝা গানের উদ্দোক্তার ঘাড়েই বর্তাবে সন্দেহ নেই। হাদীসে প্রতিটি নামায ত্যাগের পরিণামে দোযখের আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। কাজেই অগণিত লোকের নামায নষ্ট করার জন্য দায়ী ব্যক্তির শাস্তির পরিমাণ কতই না ভয়াবহ!

সপ্তমতঃ প্রায়ই দেখা যায় একবার নাচ–গান উপভোগের অভ্যাস গড়ে উঠলে এসবের অপকারিতার কথা মন থেকে উবে যায়, গোনাহ করে মনে খারাপ লাগার পরিবর্তে উল্টো আরো অনন্দ অনুভূত হয়ে থাকে, মানব মনের এ পর্য্যায় অত্যন্ত বিপজ্জনক। রসূল (সাঃ) 'পুণ্য করে আনন্দিত হওয়া আর পাপ করে অনুতপ্ত হওয়া'কে মুসলমানিত্বের নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং, যে পাপ করে আনন্দিত হয় তাকে কোন্‌ পর্যায়ের ঈমানদার বলবেন? এ তো গেলো সঙ্গীতানুষ্ঠান উপভোগকারীদের অবস্থা, আর

আসরের আয়োজকের কাঁধে তো সকল উপভোগকারীর সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে।

অষ্টমতঃ অনেকে গায়িকাদের প্রেমে পড়ে স্বীয় ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, ধর্ম সবকিছু বিসর্জন দিয়ে থাকে। এ অশুভ পরিণতির ক্ষেত্রেও উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে, তাই এ সকল পাপেও তার একটা অংশ থাকে। আর কৃত্রিম প্রেম এতই অনিষ্টকর যে তা মানুষকে নাস্তিকতার দ্বার প্রান্তে পৌছিয়ে দিতে পারে। মানুষের মন তো একটাই, এতে একটা প্রেমই ঘর বাঁধতে পারে। সৃষ্টির প্রেমে মজে গেলে স্রষ্টার প্রেম মনের অজান্তেই হ্রাস পেতে থাকে। একসময় সৃষ্টি-প্রেম যখন সারা হৃদয়-মন জুড়ে ফেলে তখন স্রষ্টা-প্রেম আর মোটেও অবশিষ্ট থাকে না। এ পর্যায়েই তো নাস্তিকতার উদ্ভব ঘটে।

এ প্রসঙ্গে একটা উপদেশমূলক কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। এক লোকের থাকার ঘরটা বাইরের দিক থেকে অনেকটা গোসলখানার মতোই দেখাত। সে একদিন ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিল, এমন সময় এক যুবতী এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'শীতল পানির স্নানাগারে যাওয়ার পথটা কোন্‌দিকে?' জবাবে লোকটি নিজের শোবার ঘরটিই দেখিয়ে দিল। যুবতী ভিতরে গেলে লোকটিও তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো। ঘরে প্রবেশ করেই যুবতীটি লোকটির কুমতলব বুঝতে পারলো। তখন এ পাষণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মেয়েটি একটা বুদ্ধি আটলো, সে আপাতঃদৃষ্টিতে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে ঘর-সংসার করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করতে বললো। মেয়েটির পরামর্শ অনুযায়ী আসবাব-পত্র কেনাকাটার জন্য লোকটি বেরিয়ে গেল। সেই সুযোগে মেয়েটি আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করলো। ঘরে ফিরে যুবতীকে না পেয়ে লোকটি উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তায় বেরিয়ে এল, সারাদিন অলিতে গলিতে তার অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কোথাও মেয়েটির সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত লোকটি পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাগল হয়ে সে সবসময় বলতোঃ

يَا رَبِّ قَائِلَةٍ يَوْمًا وَقَدْ تَعِبَتْ
أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَابِ

"হায় প্রভু! আমার একদিনের সহচরী শীতল পানির গোসলখানা অন্বেষণকারিনীর সন্ধান কোথায় পাবো?"

এমনি ভাবে লোকটির সারাটি জীবন ঐ যুবতীর বিরহে অস্বস্তিতে কেটেছে। এমনকি মৃত্যুর সময় উপস্থিত সবাই যখন কলিমা পড়ার জন্য তাকে উপদেশ দিয়েছিল তখনও সে তার সেই জপই উচ্চারণ করেছিল। অবশেষে এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছিল। এ ধরণের মরণ থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

অন্য এক কাহিনীতে, এক ব্যক্তি তার প্রেমিকার বিরহ যাতনায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। কিছুদিন পরে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যস্থতায় প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার আশা পেয়ে হঠাৎ বেশ সুস্থ হয়ে উঠে লোকটি। প্রেমিকাকে নিয়ে আসার দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। এমন সময় এক বন্ধু বললো, তোমার প্রেমিকা তো আমার সাথেই তোমার কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল, তবে পথিমধ্যে এসে সে বলতে লাগলো, 'আমি কলঙ্কিত হতে যাবো না'। আমি তাকে অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আসতে রাজী হল না। একথা শুনে প্রেমিকের অবস্থা আগের থেকে আরো শোচনীয় হয়ে একেবারে মৃত্যু-দ্বারে উপনীত হলো। মুমূর্ষু অবস্থায় সে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো—

اَعْلَمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيلِ وَيَا شِفَاءَ الْمُدْنَفِ الْخَلِيلِ
رِضَاكَ أَشْهَى إِلَى فُؤَادِي مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

"তোমার সন্তুষ্টি খোদার রহমত থেকেও শ্রেয়" (নাউযুবিল্লাহ)। একথা শুনে উপস্থিত একজন বললো, দূর্মুখ! খোদাকে ভয় কর, একি বলতে শুরু করেছিস।' কিন্তু বললে কি হবে? যা হবার তো হয়েই গিয়েছিল, উপদেশ দাতা লোকটি দরজার কাছে যেতে না যেতেই এই ব্যর্থ প্রেমিকের ইহলীলা সাঙ্গ হলো।

এখানে আরো একটা কাহিনীর অবতারনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জনৈক মিসরীয় একটি মসজিদে থাকতো। সবসময় আল্লাহর ইবাদতে

মশগুল থাকার ফলে তার চোখ মুখ থেকে যেন এক স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত। মসজিদের পাশেই এক খৃষ্টানের বাড়ী ছিল। একদিন ঐ ধার্মিক লোকটি আযান দেয়ার উদ্দেশ্যে মিনারে আরোহন করলো। মিনার থেকে সে খৃষ্টানের যুবতী মেয়েকে দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে গেল। আযান দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সে তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে এসে সোজা খ্রীষ্টানের ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে প্রবেশ করে সে তার অভিলাষ ব্যক্ত করলো। তার কথা শুনে খ্রীষ্টানের মেয়েটি বললো, 'তুমি তো মুসলমান আর আমি খৃষ্টান ; স্বভাবতই আমার মা-বাবা তোমার কাছে আমাকে সমর্পণ করতে সম্মত হবেন না। তবে তুমি যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে পারে।' লোকটি তৎক্ষণাৎ খৃষ্টান হয়ে গেল। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, তাদের বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার আগে একদিন কোন এক কাজে লোকটি উপরে উঠেছিল এবং সেখান থেকে নীচে পড়ে সে মারা গেল। এইভাবে خَسِرَ الدُّنيَا وَالْاٰخِرَةَ লোকটি দ্বীন-দুনিয়া উভয় কূল হারাল।

কৃত্রিম প্রেমের এতসব দুর্গতির কাহিনী শুনেও অনেকেই এ বিপদকে অত্যন্ত ছোট করে দেখেন। আর অনেকে তো একে মহাপ্রভুর নৈকট্য লাভের মোক্ষম উপায় ও অনিন্দ সুন্দরের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ মনে করে থাকেন। (নাউযুবিল্লাহ) এ ধরণের মন-মানসিকতাকে স্পষ্ট ধর্মদ্রোহীতা ও যিন্দিকী ধ্যান-ধারণা ছাড়া আর কি বলা হয়? কখনো কখনো কোন কোন মহান বুযুর্গদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এসব অপকীর্তিকে আমাদের সমাজে চালিয়ে দেওয়ার পায়তারা চলতে দেখা যায়। আসলে এরা এসব উক্তির মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম।

নবমতঃ অনেক অপদার্থ তো এসব নাচ-গানকে সুনাম ও ভদ্রতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। বিয়ের অনুস্ঠানে নাচ-গানের আসর না হওয়াটা তাদের কাছে রীতিমত অপমানকর ব্যাপার, এতে যে বিয়ের সকল আনন্দই মাটি হয়ে গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কেউ যখন পাপ করতে পেরে আত্মগর্ব লাভ করে, আর তা না করাকে অপমানকর মনে করে, তার কাছে পাপ কর্মটা একটা হালকা জিনিসই নয় বরং আনন্দের বস্তুতে পরিণত হয়। এ

অবস্থাকে উলামায়ে কিরাম ঈমান হারানোর অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

দশমতঃ এসব গীতি অনুস্ঠানে অর্থ সম্পদের সীমাহীন অপচয় হয়ে থাকে। অথচ কোরআন হাদীসে অপচয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন 'অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ।' যে স্বীয় অর্থ সম্পদ গান-বাজনায় ব্যয় করলো সে তো আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে নিতান্ত তুচ্ছ ভেবে এর নাশোকরী করলো।

একাদশতঃ গানের আসরের সংবাদ পেয়েও যারা উপস্থিত হতে পারেন নি তারা অনেক সময় পত্র মারফত আয়োজনকারীকে অভিনন্দন পাঠিয়ে থাকেন। এভাবে তারাও পাপের ভাণ্ডারে ভাগ বসান। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে, সে ঐ লিপ্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ গোনাহে গোনাহগার হবে'। এ ছাড়াও এসব সঙ্গীতানুস্ঠানে আরো কত যে পাপের নির্লজ্জ মহড়া চলে—তার ইয়ত্তা নেই।

বিয়েতে গানের আসরের উদ্যোক্তারা গা বাঁচানোর চেষ্টায় অনেক সময় এ অজুহাত পেশ করে থাকেন যে, 'কনে পক্ষের বারংবার দাবীর মুখে আমার কিই-বা করার আছে, তারা কোনমতেই মানছে না, তাই বাধ্য হয়েই গানের আয়োজন করতে হল'। তার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, কনে পক্ষ যদি এমন দাবী জানায় যে, 'তোমার মা-বোনকে আসরে এসে নাচতে দিলে আমরা মেয়ে দেব নতুবা দেব না' তাহলে তিনি কি করবেন? শুধু কি সুন্দরী কনে ঘরে তোলার প্রয়োজনে সকল অপমানকে সানন্দে বরণ করে নেবেন! নাকি অগ্নিশর্মা হয়ে কনে পক্ষকে এ ধরণের অশালীন দাবীর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে উদ্যত হবেন? শরীয়তে নিষিদ্ধ বস্তুকে নিজের কাছে অপছন্দনীয় বিষয়ের অনুরূপ ঘৃণা করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা থাকলে যেমন বিয়ে হওয়া না হওয়ার পরওয়া করা হয় না, শরীয়তী বিধান লংঘিত হওয়ার আশংকা থাকলেও তেমনি স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া

উচিত—'এ বিয়ে হোক আর না-ই হোক ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে নৃত্য-গীতের আয়োজন করা যাবে না।'

আমি বলতে চাই, এসব ব্যাপারে অন্যের পক্ষ থেকে বাধ্য-বাধকতা আরোপের অজুহাত অযৌক্তিক। তাছাড়া শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে কেউ যদি বিয়েতে নাচ-গানের ব্যবস্থা করে তাহলে সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কর্তব্য হবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাকে একথা জানিয়ে দেওয়া উচিত যে,—তুমি যখন আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির পরওয়া করলে না, তখন আমরা কোন দুঃখে তোমার অসন্তুষ্টির পরওয়া করবো।

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانہ کآشنا باشد

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মধ্যবয়েসী যুবকদের মাঝে পাশা খেলা, দাবা খেলা, কবুতর বাজী, মোরগের লড়াই, ষাড়ের লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি আরো কত রকমের কুপ্রথা প্রচলিত আছে। মদ্যপান ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধকরণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,—'শয়তান তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।' এ আয়াত থেকে স্বতঃসিদ্ধভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার যে কারণ নির্দেশ করেছেন, তা যে বস্তুতেই পাওয়া যাবে তাকেই হারামের পর্যায়ভুক্ত করা হবে। খেলোয়াড়গণ যে কি পরিমাণ মদমত্ত হয়ে এসব খেলায় মগ্ন থাকে তা না দেখলে উপলব্ধি করা মুশকিল। নামায তো অনেক পরের কথা, খাওয়া-দাওয়া পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রয়োজনের দিকেও তাদের খুব একটা খেয়াল থাকে না এ সময়। প্রতিপক্ষকে গালমন্দ করা তো এসব খেলার স্বাভাবিক গতিধারা বলে ধরে নেয়া যায়, এমনকি সময় সময় তা হাতাহাতির রূপ পরিগ্রহ করে। এতসব মন্দ পরিণতির প্রকট আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত খেলাগুলোর হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়—নেই।

দাবা ও অন্যান্য খেলা

যেসব খেলা ঘুটির সাহায্যে খেলতে হয় সেগুলির বহুবিধ অপকারিতা রয়েছে। মুসনাদে আহমদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, মুআত্তা ইমাম মালিক প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,—'যে ঘুটি দিয়ে খেলা করে সে আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে।' মুসনাদে আহমদে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'যে ব্যক্তি ঘুটি দিয়ে খেলা করার পর উঠে নামায আদায় করলো, সে যেন পুঁজ বা শুকরের রক্ত দিয়ে অযু করে নামায পড়লো।' হযরত আলী (রাঃ) বলেন,—'দাবা অনাবরদের জুয়া খেলা।' হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন,—'পাপীরাই দাবা খেলে থাকে' অর্থাৎ, এ খেলাতে শুধুই পাপ। জনৈক প্রশ্নকারী হযরত আবু মুসা আশাআরীর কাছে দাবা খেলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বললেন,—এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, আর আল্লাহ গর্হিত কাজকে পছন্দ করেন না। বায়হাকীর শো'আবুল ঈমানে উপরোক্ত তিনটি হাদীসই উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়াও হেদায়া, দুররে মুখতার প্রভৃতি ফিকাহের কিতাবে দাবা খেলাকে সম্পূর্ণ হারাম বলা হয়েছে,—চাই তা বাজি ধরেই খেলা হোক আর না ধরেই হোক।

অনেকে দাবী করেন যে, দাবা খেলা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে ও যুদ্ধ-বিদ্যায় দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়ে থাকে। বুদ্ধি বিকশিত হওয়ার এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক—এ খেলায় অত্যধিক মনোযোগ দিলে বুদ্ধি বাড়ার তো কোন কথাই নয় বরং উল্টো আরো বুদ্ধি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রতিনিয়ত খেলায় মগ্ন থাকার ফলে দাবার অনেক চাল মুখস্ত হয়ে যাওয়াও বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। আর ঐসব মুখস্ত চালে ঘুটি পরিচালনা করলে তা থেকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন বা অন্য কোন ধরণের উপকার লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। তেমনি যুদ্ধবিদ্যার সাথেও এ খেলার কোন মিল নেই। খেলার নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে—রাজা-মন্ত্রী, হাতী-ঘোড়া, নৌকা-সৈন্য কোন্‌টা কোন্‌ দিকে চালতে হবে তার একটা বাধাধরা নিয়ম রয়েছে, যার ব্যতিক্রম হলে তা আর খেলাই থাকবে না। অপর পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার বেলায় এমন অলংঘনীয় নীতিমালার বালাই নেই। সেখানে প্রধান সেনাপতির তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

উদাহরণতঃ সমর ক্ষেত্রে হাতীকে অনেক সময় সোজাসুজি অগ্রসর হতে হয়, অথচ দাবার বোর্ডে তা কেবল কৌনিক চালেই চলে থাকে। একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, সমরক্ষেত্র ও দাবার দানের পৃথক পৃথক আইন-কানুন রয়েছে, একটির আইন অন্যটিতে হুবহু প্রযোজ্য নয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপের পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। মোটকথা, 'দাবা বুদ্ধির বিকাশে ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনে সহায়ক'—এ দাবী সর্বৈব অযৌক্তিক ও অবাস্তব। আর এ দাবী কখনো স্বীকার করে নিলেও একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে মুক্ত চিন্তার ঘোড়ায় চড়ে যথেচ্ছ বিচরণ করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘোরতর অপরাধ।

অনেকে আত্মরক্ষার্থে বলে থাকেন, 'ইমাম শাফেয়ীর মতানুযায়ী তো দাবা খেলা নিষিদ্ধ নয়, আমরা না হয় এক্ষেত্রে তার মতামতকেই মেনে নিলাম, তাতে দোষের কি? এ প্রশ্নের জবাবে সর্বপ্রথমেই বলতে হয়, কোরআন-হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জরুরী প্রয়োজন ছাড়াই কেবল কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য মাযাহাবের অনুসরণ করা বৈধ নয়। এ ধরণের ক্রিয়াকর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হলে ধর্মকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার বিস্তর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যাপারেই কোন না কোন মাযহাবে আত্মতুষ্টি-মূলক বিধান তো পাওয়া যাবেই। তাই বলে, নিজের সুবিধামত মাযহাবের অনুসরণ কি প্রবৃত্তি পূজার সমার্থক হবে না?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনে করুন, জনৈক অযুবিশিষ্ট ভদ্রলোকের শরীর থেকে রক্ত নির্গত হলে তাকে বলা হলো, 'আমাদের মাযহাব মতে তো আপনার অযু নষ্ট হয়ে গেছে আবার অযু করে আসুন'। ভদ্রলোকটি জবাবে বললেন, এ ক্ষেত্রে আমি শাফেয়ীর (রহঃ) মাযহাব অনুসরণ করবো, অতএব আর অযু করার প্রয়োজন নেই। অল্পক্ষণ পরে ঐ ভদ্রলোকটিই সাবেগে কোন মহিলার গা স্পর্শ করলে তাকে বলা হলো, এবার তো শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ীই আপনার অযু ফাসিদ হয়ে গেছে, ভদ্রলোক জবাব দিলেন এখন আমি আবার হানাফী মতাবলম্বী হয়ে গেছি, কাজেই অযু শোধরানোর দরকার হবে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, একই অযুর পরে শরীর থেকে

রক্ত নির্গত হওয়া ও সাবেগে নারী স্পর্শ করা—এ উভয় কারণ মিলিত হওয়ার দরুন সকল মাযহাব অনুসারেই ভদ্রলোক অযু করে অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করছে। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মযহাবের অনুসরণ ধর্মকর্মে এমনি ধরণের হাজারো দুস্কৃতির উদ্ভব ঘটাবে সন্দেহ নেই। এসব বিবেচনা করেই ফেকাহ্‌বিদগণ যে কোন একটা নির্দিষ্ট মযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ধর্মপালনে যাতে করে অসৎ উদ্দেশ্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে এবং ধার্মিকগণ যাতে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত না হন—তারই প্রতিকার বিধান করা হয়েছে এর মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে দাবা খেলার বৈধতার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। যেমন, বেশী করে বা বেশী সময় ধরে.না খেলা এবং খেলায় এত বেশী মগ্ন না হওয়া যদ্দরুন নামাযের সময়ের প্রতি কোন খেয়াল থাকে না। লক্ষণীয় যে, এসব শর্ত বজায় রেখে দাবা খেলা অত্যন্ত দুরূহ।

তৃতীয়তঃ নেসাবুল ইহতিসাব গ্রন্থে পরবর্তীতে ইমাম শাফেয়ীর উক্ত মতামত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—এখন তার ইমাম শাফেয়ীর মতানুসরণের অজুহাত দেখিয়ে দাবা খেলার সুযোগ নেই। এ খেলায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়া যে কত বড় আশংকাজনক ব্যাপার 'জওয়াবে কাফী' নামক পুস্তকে বর্ণিত এক দাবাড়ুর কাহিনী থেকে তা আঁচ করা যেতে পারে। বর্ণিত আছে,—মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জনৈক দাবাড়ুকে কলিমা পড়তে বলা হলে কলিমার পরিবর্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'তোমার রাজা চেক পড়েছে।' এই কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তার প্রাণ বায়ূ ইহধাম ত্যাগ করলো। আসল ব্যাপার হচ্ছে, কোন কিছু মনের গভীরে গেঁথে গেলে--আপাদমস্তক গিলে ফেললে, মৃত্যুর সময়ও তার কথাই স্মরণ হবে, এই চিন্তা নিয়েই মৃত্যুবরণ করবে—এটাই স্বাভাবিক।

কবুতর বাজী

কবুতর বাজীর অবৈধতা সম্পর্কেও কারো কোন দ্বিমত নেই। একবার এক ব্যক্তিকে কবুতরের পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখে রসূল (সাঃ) মন্তব্য করেছিলেন,—'এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছু ধরেছে।' হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী (রহঃ) আপন আপন কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। অনেক কবুতরবাজদের অন্যের কবুতর আটক করার অভ্যাস রয়েছে। এ কাজ সুস্পষ্ট লুণ্ঠন এবং পরধন আত্মসাতের এক ভাল মানুষী নমুনা ছাড়া কিছুই নয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে—"কেউ কারো কিছুতে অনাধিকার চর্চা করে থাকলে কিয়ামতের দিন ঐ যালেমের পুণ্য মযলুমকে দিয়ে দেওয়া হবে আর মযলুমের পাপ যালিমকে দেওয়া হবে ; অতঃপর যালেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" কোন কোন কবুতরবাজ হয়তো এ অজুহাত পেশ করবেন যে—অন্যান্যরাও তো তোমাদের কবুতর ধরে ফেলে, এমতাবস্থায় আমরা অন্যদের কবুতর ধরলে দোষ কি' তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতি এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যবসা সিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শর্তাবলী বর্তমান থাকলে তবেই নিজের কবুতরের পরিবর্তে অন্যের কবুতর আটকানো শরীয়তমত বৈধ হবে। এতদ্ভিন্ন, প্রাণপণ চেষ্টা করে কবুতর ধরলেও তা অন্যায়ই হবে। এ পদ্ধতিতে সবসময়ই কোন না কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অধিকন্তু যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারও প্রতিপক্ষকে ঠকাবার একটা মনোবৃত্তি থাকে। সুযোগের অভাবে প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ হলেও প্রতিপক্ষকে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই গোনাহ হবে। রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'দুই মুসলমান পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে একজন অপরজনকে হত্যা করলে, নিহত ও হন্তা উভয়ই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)! হন্তার দোযখে যাওয়ার কারণ তো বুঝলাম, তবে নিহত ব্যক্তির দোযখী হওয়ার হেতু কি? জবাবে রসূল (সাঃ) বললেন,—'তার অন্তরেও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রবল ইচ্ছা ছিল।'

কেউ হয়তো দাবী করতে পারেন, কবুতরবাজগণ এ ধরণের অদল-বদলে সর্বদাই সম্মত যে, যে-ই ধরতে পারে সে-ই কবুতরের মালিক হবে। এ দাবীর অসারতার প্রমাণস্বরূপ বলবো, এ ধরণের সম্মতি তো জুয়া খেলায়ও থাকে। সম্মতি থাকার কারণে জুয়াকে তো কেউ হালাল বলতে পারবে না। কোরআন মজীদের অদ্ব্যর্থ আয়াত দ্বারা একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এখন কোনক্রমেই এর বৈধতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, কবুতরবাজীর নেশা কাউকে পেয়ে বসলে তার না নামাযের খেয়াল থাকে, না পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনার প্রতি তার কোন লক্ষ্য থাকে। কবুতরবাজী হারাম হওয়ার এটাও একটা কারণ। কেননা, ইবাদত আর উক্ত অধিকারপ্রসূত দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেওয়া ওয়াজিব, আর ওয়াজিব আদায় না করা হারাম। ওয়াজিব আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলেই কবুতরবাজী হারাম। অতএব, এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিস্কার।

এ ছাড়াও কবুতরবাজদের যত্রতত্র বিচরণ, বে-পরাওয়াভাবে বাড়ী-ঘরের চালায়-ছাদে আরোহণ করে পর্দানশীন মহিলাদের পর্দাভঙ্গ করা, কবুতরের উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি ঢিল ছুড়ে পাড়া-প্রতিবেশীকে উৎপাত করা ইত্যাকার আচরণ অত্যন্ত মামুলী ব্যাপার মনে হলেও মূলতঃ চরম ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুররে-মুখতার কিতাবে বলা হয়েছে,—নিষেধ করার পরও যদি কেউ এ অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তাহলে নিষেধকারী ঐ কবুতর জবেই করে নিতে পারে।' সর্বশেষে বলতে চাই, যাতে এতসব দোষ-ত্রুটির সমাহার ঘটে তা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

ঘুড়ি উড়ানো

ঘুড়ি উড়ানোর মতো নিন্দনীয় প্রথাও আমাদের সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কবুতর-বাজীতে যে সমস্ত ক্ষতিকারক দিক রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই ঘুঠি উড়ানোর শখেও পাওয়া যায়। যেমন ঃ

প্রথমতঃ ঘুড়ির পেছনে পেছনে ছুটা। রসূল (সাঃ) কবুতরের পশ্চাদ্ধাবনকারীকে যে কারণে শয়তান বলে অভিহিত করেছেন, সেই একই

কারণে ঘুড়ির পশ্চাদ্ধাবণকারীকেও এর পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ ঘুড়ি লুণ্ঠন করার অভ্যাস। এ সম্পর্কে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে,—রসূল (রাঃ) বলেছেন;– 'লোকে যার প্রতি দৃষ্টি উঁচু করে তাকায় তাকে লুটে নেওয়া মুমিনের কাজ নয়। অর্থাৎ, এ ধরণের কর্ম ঈমানের পরিপন্থী। এ হাদীসের মর্মার্থ যাই হোক না কেন, বাহ্যতঃ লুটেরাদেরে ঈমানের গণ্ডী বহির্ভূত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ হয়তো দাবী করতে পারেন,—'এ ক্ষেত্রে তো সত্বাধিকারীর পরোক্ষ অনুমতি বিদ্যমান, কাজেই এখানে এ হাদীস প্রযোজ্য নয়।' জবাবে বলবো, মালিকের পরোক্ষ অনুমতি থাকার এ দাবী সম্পূর্ণ অবাস্তব। আসলে ঘুড়ি লুটের রেওয়াজটা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার দরূন মালিক নিজের ঘুড়ি দাবী করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়—আন্তরিক সন্তুষ্টি বা সম্মতি এখানে অনুপস্থিত। মালিক তার দাবী উপেক্ষিত হবে না বলে জানলে তো অন্যকে তার ঘুড়ি নিতে দিতে কখনও রাজী হতো না। এ কারণেই ঘুড়ির সূতা কেটে গেলে মালিক অতি সত্বর দৌড়ে গিয়ে তা কুড়িয়ে আনত সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অবশেষে হয়তো দূর্ভাগ্যবশতঃ ঘুড়িটা হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে সে যে চেষ্টা করলো, তা কি তার অসম্মতির প্রমাণ নয়।

তৃতীয়তঃ ঘুড়ির সূতা লুট করা ঘুড়ি লুটের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। কেননা, ঘুড়ি তো একজনই লুট করে থাকে আর তাতে এক ব্যক্তিরই পাপ হয়, পক্ষান্তরে সূতা লুটে অনেক লোক পাপী হয়ে থাকে। এতসব লোকের পাপের জন্য কার্যতঃ যে ব্যক্তি ঘুড়ি উড়ায়, সেই দায়ী। তাই উপরোক্ত প্রতিজ্ঞানুসারে সে সকলের পাপের সমভাগী হয়।

চতুর্থতঃ প্রত্যেক ঘুড়ি উড্ডয়নকারীরই অপরজনের ঘুড়ির সূতা কাটার ইচ্ছা থাকে। অথচ কোন মুসলমানের ক্ষতি করা যে হারাম তা সবারই জানা। এ হারাম কাজের নিয়ত করার কারণে উভয়ই গোনাহগার হয়ে থাকে।

পঞ্চমতঃ ঘুড়ি উড়ানো নেশায় পরিণত হলে নামাযের প্রতি কোন খেয়াল থাকে না। আগেই বলেছি, কোরআন মজীদে নামাযে অমনোযোগিতাকে মদ

ও জুয়া হারাম হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ বাড়ী–ঘরের চালে–ছাদে সময়–অসময় ঘুড়ি উড়ানোর জন্য আরোহণ করে মহিলাদের পর্দা নষ্ট করা হয়।

সপ্তমতঃ ছাদের উপর উঠে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে অলক্ষ্যে পিছন দিকে সরতে সরতে নীচে পড়ে আহত–নিহত হওয়ার খবর আজকাল সংবাদ পত্রের পাতা উল্টালে প্রায়ই নজরে পড়ে। এ ধরণের আত্মসংহারী কাজ কোরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) রেলিংবিহীন ছাদে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। অসর্তকাবস্থায় নীচে পড়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই এ নিষেধাজ্ঞা। সামান্য ভুলের দরূন কত বিরাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তা–ও আমাদের প্রিয় রসূল (সাঃ) বলে গেছেন। অথচ আমরা তাঁর আনীত বিধানাবলীর প্রতি কত যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করি! আফছুছ, আমাদের এ আচরণের জন্য?

অষ্টমতঃ ঘুড়ি তৈরী করে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উপকরণ কাগজ আর বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অন্যতম খাদ্য আটার মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশাকে রুটির কদর করতে আদেশ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, খাদ্য–দ্রব্যের অসম্মান ও অপব্যবহার নিষিদ্ধ। তেমনি ভাবে, লেখাপড়ার উপকরণাদির যথাযথ কদর করা যে জরুরী তাও সবারই জানা। ঘুড়ি তৈরী করা কাগজ ও আটা উভয় বস্তুর জন্যই অবমাননাকর।

নবমতঃ ঘুড়ি উড়ানোর জন্যে বেহিসাব অর্থ–কড়ি খরচ করা হয়। অথচ কোরআন মজীদে অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

বোবা প্রাণীর লড়াই

মোরগ, ষাড় ইত্যাদির লড়াই প্রসঙ্গে হাদীসে আছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন—জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে লড়াই বাঁধানো নিষেধ।' মোরগ, ষাড়, তিতির, ভেড়া ইত্যাদি সব প্রাণীই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অযথা কোন প্রয়োজন ও লাভ ছাড়াই বোবা জন্তুদেরে কষ্ট দেওয়া তো বিবেকের পরিপন্থী,

এমনকি অনেক সময় তা জুয়া খেলায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। জুয়া খেলা তো কবীরা গোনাহ। এ ছাড়াও অনেক সময় জরুরী কর্তব্য পালনে অবহেলা করেও বিরাট পাপ হয়। অধিকন্তু, সকল দর্শকমণ্ডলীর পাপের সমান বোঝা একা আয়োজনকারীই বহন করবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আতশবাজীও এ ধরনেরই একটা অশুভ প্রথা। এতেও অনেক অপকারিতা রয়েছে।

এক—অর্থের অপচয়—যা কোরআন মজীদের স্পষ্ট নির্দেশ মোতাবেক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দুই—এতে করে নিজের, সন্তান-সন্ততির ও পাড়া-পড়শীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে অনেক সময়। আতশবাজী করে হাত নষ্ট হওয়া, মুখ পোড়া, পোশাকে আগুন লাগা ইত্যাদি কত শত ঘটনা ঘটেছে। এ ধরণের আত্মধ্বংসী ক্রিয়াকলাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে বলেন—'তোমরা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না'। এই কারণেই বিনা প্রয়োজনে আগুন নাড়াচাড়া করা এবং আগুনের নিকট গমন করা হাদীস অনুযায়ী নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে, উন্মুক্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাতি কাছে রেখে ঘুমাতে নিষেধ করা হয়েছে।

তিন—আতশবাজীর একটা অন্যতম উপাদান হিসাবে কাগজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিদ্যাশিক্ষার উপকরণাদির সাথে অসদাচরণ করা যে অত্যন্ত মন্দ কাজ তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আরো তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে, লেখা কাগজ এমনকি কোরআন হাদীসের পাতা পর্যন্ত এ কাজে ব্যবহার করতে তারা মোটেও দ্বিধাবোধ করে না। জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন,—'আমি কোরআন শরীফের পাতা দিয়ে প্রস্তুতকৃত খেলনা দেখেছি।'

চার—এতে করে শিশুদেরকে জীবনের প্রারম্ভ থেকে পাপ কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অথচ আল্লাহ রসূলের আইন শিশুদেরকে শৈশবেই ইলম ও

আমলের প্রশিক্ষণদানের নির্দেশ দিয়েছে। এ যেন খোদায়ী বিধানের সাথে বিদ্রোহ। বিশেষ করে শবেবরাতের ন্যায় বরকতময় রাতে আতশবাজীকে যেন পুণ্য-তালিকার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পুণ্যময় মুহূর্তগুলোতে ইবাদত-বন্দেগী করা যেমন অত্যাধিক পুণ্য লাভের উপায়, সেইক্ষণে পাপ কাজ করলে গোনাহও তেমনি বেশী হয়ে থাকে।

পাঁচ—আতশবাজীর অংশ হিসাবে অনেক সময় বেল, ডালিম, জাম্বুরা ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। এসব বস্তু লোকজনের মাথায় ও শরীরে পতিত হয়ে অনেককে আহত করে। ইয়াজুজ-মাজুজ যেমন করে আকাশের পানে তীর নিক্ষেপ করবে এরাও তা-ই করে। অথচ কাফেরদের অনুকরণ করা হারাম। অনেকে বলেন, 'হজ্বের মওসুমে মক্কা মোআয্যামায় তোপধ্বনি করা হয়, আতশবাজী বৈধ না হলে সেখানে এ কাজ হয় কেন?' এর জবাবে বলবো, প্রথমতঃ সাধারণ সৈনিকোচিত ক্রিয়াকলাপ শরীয়তের দলীল নয়, বরং দ্বীনদার তাত্ত্বিক আলেমের বক্তব্য যখন শরীয়তের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তখনই তা দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বলাবাহুল্য, তোপধ্বনি করা সৈনিকদের কাজ, কোন আলেমের ফতওয়া নয়।

দ্বিতীয়তঃ তোপ ধ্বনিতে কিছুটা ভালো দিকও রয়েছে, যেমন—ইসলামের শৌর্য-বীর্যের বহিঃপ্রকাশ, হজ্বের বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কার্য সম্পাদনের ঘোষণা ইত্যাদি। অপরপক্ষে, আতশবাজী তো ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক নয়। হ্যা, কোন স্থানে যদি আতশবাজীর মাধ্যমে জরুরী সংবাদ প্রচারের নিয়ম প্রচলিত থাকে তাহলে প্রয়োজন মাফিক আতশবাজী করা জায়েয হবে। যেমন, কোন কোন স্থানে ইফতার ও সেহরীর সময় ঘোষণার উদ্দেশ্যে যে দু'এক গোলা আতশবাজী করা হয় তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত করা হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অবৈধ হবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

দাড়ি কামানো, এক মুঠোর কম রাখা, গোঁফ লম্বা করা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে অধিকাংশ যুবকগণই শোভনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ বলে ধারণা করে থাকেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে,—রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'দাড়ি লম্বা হতে দাও আর গোঁফ ছোট করে রাখ। রসূল (সাঃ) এই নির্দেশ দু'টিতে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোন নির্দেশকে ওয়াজিবরূপে পালনীয় বুঝানোর জন্যেই আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই বুঝা গেল, এ দুই হুকুমের তামিল করাও ওয়াজিব এবং অন্যথা করে দাড়ি ছোট করা বা গোঁফ লম্বা রাখা হারাম। আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযীতে রসূল (সাঃ)-এর উপর আরো বেশী গুরুত্ব প্রদান করে এরশাদ করেছেন,—'যে ব্যক্তি গোঁফ ছোট করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।'

দাড়ি ছোট করা এবং গোঁফ লম্বা করা গোনাহের কাজ জেনেও যারা সে অভ্যাস ত্যাগ করে না, বরং তাতে আনন্দ অনুভব করে, লম্বা দাড়ি রাখাকে নিন্দনীয় মনে করে, শ্মশ্রুধারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং দাড়ি রাখার কারণে কাউকে হীন ও অসামাজিক ভাবে ; তাদের ঈমানের নিস্কুলষতায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এমতাবস্থায়, স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা, ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করা এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) বিধানাবলী অনুসরণের দৃঢ় শপথ করা তাদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। বিবেকও তো বলে, নারীর মাথার কেশরাজীর ন্যায় পুরুষের মুখের দাড়িও খোদাদত্ত সৌন্দর্য্যের এক অতুলনীয় প্রতীক। মুণ্ডিত মস্তক নারী যেখানে সবার কাছেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়, পুরুষের মুখের দাড়ি মুণ্ডনে সেখানে কোন সৌন্দর্যের সন্ধান মিলে? ওসব কিছুই নয়, আসলে প্রচলিত ফ্যাশন মন-মগজে পর্দা ফেলে দিয়েছে, তাইতো সুস্থ বুদ্ধির চর্চা অনভিপ্রেত ঠেকে। অনেকে বলেন, 'আমরা তো শ্মশ্রুবিহীন তুর্কী খলিফার অনুকরণ করছি।' এর জবাব একটাই, শরয়ী আইনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ কোন কিছুর বৈধতার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যে দাড়ি মুণ্ডন করে সে যে দেশের বাসিন্দাই হোক না কেন, সে পাপী।

অনেকে নিজেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক দেখানোর জন্য দাড়ি কামিয়ে আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সামাজিক আচার-আচরণে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরও তারা অত্যন্ত নম্র-ভদ্র স্বরে বলে থাকেন—'নিজেকে এত অল্প বয়সে মুরুব্বীদের কাতারে দাঁড় করাতে চাইনে।' এটাও একপ্রকার বক্র চিন্তার ফসল। বয়স তো খোদার দান, বয়স যতই বৃদ্ধি পেল বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পেল। কাজেই একে গোপন রাখার প্রবণতা নিয়ামতের না-শোকরী করারই শামিল। বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করাও শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বোকাদের কাছে তা লজ্জার ব্যাপার হতে পারে—অনেক নাস্তিকের কাছে তো মুসলমান হওয়াটাও একটা লজ্জার ব্যাপার। খোদা না করুক, অদ্ভুত লজ্জাবোধের এ বিকৃত মানসিকতার ফলশ্রুতিস্বরূপ এসব ঈমানদারদের পক্ষে কোনদিন খোদ ইসলামকেই সানন্দে বিদায় জানানো বিচিত্র কিছু নয়। নাস্তিকদের কাছে ঘৃণিত হওয়ার ভয়ে ইসলাম ত্যাগ করা যেমন সুস্থ বুদ্ধির পরিপন্থী, কিছুসংখ্যক ফাসিকের কাছে নিন্দনীয় হওয়ার ভয়ে ইসলামের অন্যতম প্রতীককে পরিহার করাও তেমনি ঈমানের দাবীর বিপরীত। এসব চিন্তাধারার উদ্ভাবক ও প্রচারকগণ শয়তানের কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী বিশেষ।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আরবী শিক্ষার্থীদের মাঝেও এ লেবাছের প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলেছে। এসব শিক্ষার্থীদেরে গাধার পিঠে কিতাবের বোঝার সাথে তুলনা করাই শ্রেয় মনে হয়। এ সমাজে ইসলামের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার জন্য এরাই সবচেয়ে বেশী দায়ী। তারা অনেকের চাইতে বেশী জ্ঞানী। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে উপদেশ আশা করে, মাসআলা জানতে চায়, অথচ তারা নিজেরাই বে-আমল। কুরআন-হাদীসে বেআমল আলেমের কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। বেআমল আলেমদের দেখে সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। 'যে কোন পাপের শাস্তিতে ঐ পাপের উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও প্রচারকও সমভাগী হবে'—উপরোল্লিখিত এ সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে বলা যায়, বিভ্রান্ত জনসমষ্টির পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ঐ বিভ্রান্তকারী

আলেমগণও ভোগ করবে। আমার মতে, ইসলামী শিক্ষায়তনগুলোর শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর উচিত, যে ছাত্র এ ধরণের পাপ কাজে লিপ্ত হবে বা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করবে, সে তওবা না করলে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া। কেননা এ ধরণের লোক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

কবি বলেছেন—

بے ادب را علم و فن آموختن
دادن تیغ است دست راہزن

বেআদবকে জ্ঞান দান করা আর ডাকাতের হাতে স্বেচ্ছায় ছুরি উঠিয়ে দেওয়া একই কথা। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কারো নির্দেশে শরীয়তে নিষিদ্ধ রীতিতে দাড়ি-গোঁফ কাটা নাপিতের পক্ষেও নাজায়েয। কেননা, পাপের সাহায্যকারীও পাপী। এক্ষেত্রে নাপিতের উচিত, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে এ কাজ থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

দাড়িতে কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করাও মন্দপ্রথাসমূহের একটি। আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতকৃত হাদীসে রসূল (সাঃ)-এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে—'আখেরী যমানায় কিছু লোক কবুতরের বুকের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে, তারা বেহেশতের খুশবু থেকে বঞ্চিত থাকবে।' এ কাজের নিন্দনীয় হওয়ার পক্ষে সাধারণ যুক্তিও সায় দেয়—কালো খেযাব ব্যবহার করে অবশ্য-প্রকাশমান বার্ধক্যকে গোপন রাখার অপচেষ্টা করা হয়, স্বাভাবিক খোদায়ী রীতির পরিবর্তন সাধন করতে চায়—এ সবকিছুই খারাপ। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাকা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। এ চুল নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য আলোকস্বরূপ। অন্য এক হাদীসে যেমন খুশী সাজতে গিয়ে যেসব

নারী খোদার প্রদত্ত প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে ফেলে তাদের উপর অভিশাপ ঘোষিত হয়েছে। পাকা চুল উপড়াতে নিষেধ করে 'বার্ধক্য গোপন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে খোদাপ্রদত্ত আকৃতি পরিবর্তন করার মন্দ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ উভয় অপকারিতা বিদ্যমান থাকায় কালো খেযাবের ব্যবহার সাধারণ বিবেকবান মানুষের কাছেও একটা দোষণীয় কাজ।

অনেকে দাবী করেন, তিল দিয়ে প্রস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয। কারণস্বরূপ তারা বলেন—'হাদীসে মেহদী ও নীলের খেযাব ব্যবহার বৈধ বলা হয়েছে, আর মেহদী ও নীল মিলে কালো রঙ ধারণ করে।' কিন্তু মেহদী ও নীল মিশ্রিত হয়ে সবসময় যে কালো রঙ হয় তা বলা যায় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মেহদী ও নীল একত্রে মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে কালো রঙ হয়, আবার পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করলে লাল রঙ ধারণ করে। অধিকন্তু, একত্রে মিশিয়ে দিলেও সবসময় কালো রঙ হয় না। সে যাই হোক, হাদীসে যখন কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন মেহদী ও নীল মিলে কালো রঙ ধারণ করলে তা ব্যবহারও নিষিদ্ধ হবে। আর কালো খেযাব ব্যবহার যে কারণে নিষিদ্ধ সে কারণ তো তিলের খেযাবেও বিদ্যমান। কারণের সমতা হেতু উভয়ের একই বিধান হবে।

অনেকে বলেন, কালো নয় বরং নীলচে রঙের খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেননা রসূল (সাঃ) খেযাবের রঙকে কবুতরের বুকের সাথে তুলনা করেছেন, আর কবুতরের বুকতো কিছুটা নীলচেই হয়ে থাকে। কাজেই সম্পূর্ণ কালো রঙের খেযাব ব্যবহার জায়েয আছে। তাদের এ দাবী বড়ই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তারা তুলনাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, অথচ তুলনা প্রকাশের জন্য তুল্য ও তুলনীয়ের মাঝে সামান্যতম মিল থাকাই যথেষ্ট। হাদীসে হয়তো রঙের গাঢ়ত্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে, অথবা দু'য়ের মধ্যে কিছুটা গুণগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ কালো রঙের সাথে তুলনা দেখানো হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়ও প্রায়ই এ ধরণের উপমা-তুলনার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। হাদীসে ব্যবহৃত 'কালো' শব্দের অদ্ব্যর্থ উপস্থিতি সত্ত্বেও এ দিকে

লক্ষ্য না করে অযথা আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে হাদীসের ব্যাখ্যা দান সঙ্গত নয়। ফলকথা হচ্ছে, বিজ্ঞ আলেমদের নিকট এ মত সুবিদিত যে, 'কালো' শব্দের বিকল্প মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা না করে বরং তুলনাকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখাটাই অধিকতর শ্রেয়।

উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধতার দ্বিতীয় কারণ কালো রঙেই বেশী পাওয়া যায়, নীল রঙে কম। ভাবতে অবাক লাগে যা-তে নিষেধাজ্ঞার কারণ অস্পষ্ট তাকে নিষিদ্ধ রেখে, যা-তে সুস্পষ্ট কারণ বিদ্যমান তাকে জায়েয করার এ অপচেষ্টা কেন? উপরন্তু, সকল কবুতরের বুকের রঙ যে নীলচেই এরও কোন বাস্তবতা নেই। অনেক কবুতরের বুক গাঢ় কালো রঙেরও হয়ে থাকে। মোটকথা, কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার পক্ষে কোন শক্ত প্রমাণ এখনো মিলেনি। কারো যদি এ ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান করার সুযোগ হয় এবং আমার এ সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু তার কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে আমার অনুরোধ রইল, তিনি যেন প্রাপ্ত সঠিক তথ্যটি এ নিবন্ধের পাদটীকায় লিখে দেন। তবে, জিহাদের ময়দানে শত্রু সৈন্যের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে দাড়িতে কালো খেযাব ব্যবহার করাকে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ জায়েয বলেছেন। তাঁরা সম্ভবতঃ কোরআন মজীদের আয়াত—

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ۔ (الانفال ٦٠)

'এ দিয়ে আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভয় প্রদর্শন কর' এবং হাদীসে রসূল (সাঃ)—

اَلْحَرْبُ خِدْعَةٌ

'যুদ্ধ তো একটা চালাকীর ব্যাপার'—এতদুভয়ের অর্থের ব্যাপকতার সুযোগকে এভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অনেকে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-র অভিমতের উপর ভিত্তি করে কালো খেযাবের ব্যবহার বৈধ বলতে চান। ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) যদি সত্যিই এ ধরণের মত প্রকাশ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে সে মত পরিবর্তন না করে থাকেন, তাহলে তাদেরকে বলবো,—'রাসমূল মুফতী' নামক গ্রন্থে

এ মূলনীতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে,—'কোন ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) পরস্পর দ্বিমত পোষণ করলে যার মত ইমাম আবু হানিফার মতের সাথে মিলবে তার মতের উপরই ফতওয়া হবে।' বিশেষ করে কোন সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ দলীল যখন এ মতের সহায়ক হয়। সুতরাং বুঝা গেল, এস্থলে ইমাম আবু ইউসুফের মতামত গ্রহণ করা হানাফী মযহাবের স্বীকৃত মূলনীতির পরিপন্থী হবে। সেই সাথে সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ দলীল বিদ্যমান থাকায় তার মত গ্রহণ বিশ্বস্ততারও খেলাফ বটে।

প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, অন্যান্য রঙ দিয়ে যেহেতু বার্ধক্যের গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভব হয় না, তাই সেগুলো ব্যবহার করা বৈধ। পরিশেষে, ঈমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরোধিতা করেছেন বলে যাতে সন্দেহ না হয় তজ্জন্য আমরা তাঁর বক্তব্যের একটা বিকল্প অর্থ এই ধরে নিতে পারি যে, তিনি "কালো' শব্দ দ্বারা গাঢ় লাল রং বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা, গাঢ় লাল রঙে কালচে এসে যায়।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

দাড়ি উপর দিকে উঠিয়ে রাখা হারাম। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়িকে স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে কোন নির্দেশকে ওয়াজিব বুঝানোর উদ্দেশ্যেই আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। অতএব দাড়ি নীচের দিকে লম্বা হতে দেওয়া ওয়াজিব এবং উপরের দিকে উঠিয়ে বেঁধে রাখা তার পরিপন্থী হওয়ায় হারাম হবে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত রোয়াইফা (রাঃ)কে সম্বোধন করে রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'আমার পরে তুমি হয়তো অনেক দিন জীবিত থাকবে, তখন তুমি মানব জাতিকে জানিয়ে দিও, যারা দাড়িতে গাঁট বাঁধে ও অমুক অমুক কাজ করে, তাদের জন্যে মুহাম্মদের (সাঃ) কোন দায়িত্ব ও সহানুভূতি নেই'। গাঁট বাঁধার ফলে দাড়ির আসল রূপ বিকৃত হয় এবং তাতে এক ধরণের বক্রতা সৃষ্টি হয়। এ কারণ যেখানেই পাওয়া যাবে, এ সতর্কবাণীও সেখানেই প্রযোজ্য হবে।

দাড়িকে উপরে উঠিয়ে বেধে রাখলেও 'রূপ বিকৃত হওয়া এবং বক্রতা সৃষ্টি হওয়া'—এ উভয় কারণ পাওয়া যায়—সুতরাং এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে, দাড়ির এ বিকৃত রূপে অহংকার প্রকাশ পায়। অহংকার করা আর অহংকারীর বেশ ধারণ করা উভয়ই কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে হারাম। ফল কথা, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ কার্য অত্যন্ত দোষণীয়। এ অভ্যাস থাকলে আজই তওবা করে নেওয়া কর্তব্য।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

চতুর্দিক লম্বা রেখে মাথার মধ্যভাগের চুল মুণ্ডন করা, চতুর্দিক ছোট করে মধ্যে লম্বা চুল রাখা, পিছনের তুলনায় সামনের দিকে লম্বা বা ছোট চুল রাখা ইত্যাদিও দোষণীয় স্বভাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কুযা (অর্থাৎ, মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে বাকী অংশে চুল রাখা) থেকে নিষেধ প্রদান করতে শুনেছি। অনেকের ধারণা, এ ধরণের চুল রাখা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে অবৈধ; অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ যেহেতু শরয়ী নির্দেশের গণ্ডী বহির্ভূত তাই তাদের পক্ষে এ ধরণের চুল রাখা অবৈধ হবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গায়র মুকাল্লাফ হওয়ার দরুন বাচ্চাদের গোনাহ না হতে পারে, তবে তার অভিভাবকগণ তো আর গায়র মুকাল্লাফ নন। তারা কেন বাচ্চাদের এভাবে চুল কাটতে দিলেন তজ্জন্য তাদের গোনাহ হবে। আবু দাউদে এই মর্মে এক হাদীস বর্ণিত আছে যে, এক বালকের মাথায় কিছু অংশ মুণ্ডিত এবং কিছু অংশ অমুণ্ডিত চুল দেখে রসূল (সাঃ) তার অভিভাবককে এ থেকে নিষেধ করে বললেন, 'হয় সারা মাথার চুল ফেলে দিবে নতুবা পুরা মাথায় চুল রাখবে।' এ হাদীস থেকে দুইটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেল, এক—এ কাজের দোষণীয় হওয়া, দুই—রসূল (সাঃ) বাচ্চাকে দেখে নিশ্চুপ থাকলেন না, বরং তার অভিভাবককে নিষেধ করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যও এ প্রকার চুল রাখার অনুমতি নেই।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

পায়জামা-লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনুর নীচে নামিয়ে পরা, অত্যধিক লম্বা হাতওয়ালা জামা পরা, অথবা অত্যধিক লম্বা শিমলা রেখে পাগড়ী পরা নাজায়েয। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে আছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ بَطَرًا (متفق عليه)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—'নির্ধারিত সীমার নীচে নামিয়ে ইযার (কোমর থেকে নিম্নদেশে পরিধানের বস্ত্র) পরিধানকারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাদৃষ্টি করবেন না।' অন্য হাদীসে এই সীমা নির্ধারণ করে রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'টাখনুর নীচে পরিহিত ইযার দোযখের ইন্ধন হবে।' সহীহ্ বুখারীতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজার বর্ণিত তৃতীয় এক হাদীসে অন্যান্য পোষাকের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করাকে হারাম বলা হয়েছে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—'পায়জামা, জামা ও পাগড়ী সবকিছুই সীমাতিরিক্ত লম্বা করে পরা নিষিদ্ধ। যে কোন বস্ত্র অহংকারের সাথে সীমাতিরিক্ত লম্বা করে পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন না।' বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এরই সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'যে ব্যক্তি অহংকার ভরে লম্বা করে পোষাক পরবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করবেন না।' এই হাদীসে সাধারণভাবে সকল কাপড়কেই বুঝানো হয়েছে ; তন্মধ্যে ইযার দীর্ঘায়িত করার সীমা তো আগেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য পোশাক সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জামার আস্তিন হাতের আঙ্গুল পেরিয়ে যাওয়া, পাগড়ীর শিমলা পিঠের অর্ধেকের নীচে নামা নিষিদ্ধ। দুষ্ট বুদ্ধি লোকেরা বলে, হাদীসে তো অহংকারের সাথে পরতে নিষেধ এসেছে, আমরা অহংকার করি না, কাজেই আমাদের জন্য জায়েয হবে।' তাদের একথা ভালো করে

বুঝে নিতে হবে যে, 'আমরা অহংকার করি না' একথা বলা ভুল। আচ্ছা, তাহলে কেন তা করতে আগ্রহী হন? সুন্নতি লেবাস কেন পরেন না? একে গ্রহণ করতে মন সায় দেয় না কেন? কেনই বা টাখনুর উপরে পাজামা পরাকে হাস্যকর ভাবেন? এত কিছুর পরেও তা অহংকার নয়তো কি? দ্বিতীয়তঃ অহংকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যই কি হাদীসে এ শর্তারোপ করা হয়েছে? নাকি এ কাজে অহংকারের অবস্থান অপরিহার্য বুঝানো হয়েছে? যেহেতু অধিকাংশ লোকই অহংকার ভরে এ কাজ করে থাকে, তাই রসূল (সাঃ) একে উদ্ধৃত করেছেন। মনে অহংকার না থাকলেও এ কাজ নিষিদ্ধ।

এই অনুচ্ছেদের শুরুতে দ্বিতীয় যে হাদীসখানি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অহংকারের কায়েদ বাড়ানো হয়নি। এ হাদীসে শর্তহীনভাবে টাখনু পর্যন্ত ইযার পরিধানের সীমা নির্ধারণ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, অহংকার থাক আর না-ই থাক সর্বাবস্থায় এ সীমা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। তবে সীমাতিক্রমের সাথে অহংকারের গোনাহ্ মিলে আরো বেশী গোনাহ হয় এবং অহংকারবিহীন অবস্থায় সীমাতিক্রমের গোনাহ তো থেকেই যাবে। এ কাজের বৈধতা প্রমাণ করে গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কেউ যদি বলেন, আমরা এই হাদীসের অর্থের ব্যাপকতাকে অন্য হাদীস দ্বারা সীমিত করে নেব। তাহলে জবাবে বলবো, হানাফী মযহাবের উসূলে ফিকাহতে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এ নীতি নির্ধারিত হয়েছে যে, কোন দলীলের অর্থের ব্যাপকতাকে অন্য কিছু দিয়ে সীমায়িত করা যাবে না। মোটকথা এ কাজ বৈধ হওয়ার কোন পন্থা নেই। কেউ কেউ পরহেযগারী দেখানোর জন্য নামাযের সময় পাজামা টাখনুর উপরে উঠিয়ে লন। নামাযের বাইরেও তো গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা ওয়াজিব! কাজেই নামাযের সময় পাজামা উঠালে ওয়াজিব তরকের গোনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ লম্বা লম্বা পাজামা তৈরী করে টাখনুর উপরে বোতাম লাগিয়ে দেন, যাতে করে পাজামার বেশ খানিকটা কাপড় টাখনুর উপর অযথা ঝুলে থাকে। স্মরণ রাখা আবশ্যক, টাখনু ঢাকলো কিনা সেটা বড় কথা নয়, বরং আসল পাপ হচ্ছে কাপড় নষ্ট করার দরূন। এটাও মনে থাকা দরকার, এ ধরণের অনৈসলামিক পোষাক সেলাই করা দর্জির পক্ষেও জায়েয নয়।

কেননা, গোনাহের কাজে সহায়তা করাও গোনাহ। এ ধরণের পোষাক সেলাই করতে সরাসরি অস্বীকার করা কর্তব্য। এই কাপড় সেলাই করাই তো আর আয়ের নির্ধারিত উপায় নয় বরং অন্যান্য কাপড়ও তো সেলাই করার আছে।

নবম অনুচ্ছেদ

ঘরে ছবি লাগানো এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা এ ধরণের মন্দ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—'যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না'। অন্য হাদীসে রসূল (সাঃ) বলেছেন,—'প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীকে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন।' বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূল (সাঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে—'গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, শিকার ও শস্য ক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণ- এ তিন প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কুকুর পালন করলে তার পুণ্য থেকে প্রতিদিন এক ক্বিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস করা হবে।" পার্থিব হিসাবে 'এক ক্বিরাত' উহুদ পাহাড়ের সমান বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা ছবি প্রস্তুত, ছবি রাখা এবং বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। আধুনিক সভ্য জগতের কাছে ছবি ও কুকুর অত্যাবশ্যকীয় জীবনোকরণ রূপে বিবেচিত হয়। ছবিকে ঘরের অবিচ্ছেদ্য অংগ এবং কুকুরকে পরিবারের সদস্য গণ্য করা হয়। এতদুভয়কে ব্যাপকভাবে বরণ করে নিতে তারা বিন্দুমাত্র সংকোচিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

কোন কোন যুক্তি-পুজারী তো কুকুরের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন। এতে করে পরোক্ষভাবে এ দাবীকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে, 'শরীয়তের এ নির্দেশ একটা অহেতুক, অযৌক্তিক বাজে কথা।' (নাউযু বিল্লাহ) কারো মনে সত্যি সত্যিই এ ধরণের কোন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকলে তার ঈমান নবায়ন করা অত্যাবশক। মুসলমান হওয়ার পর শরীয়তী বিধি-বিধানের হেতু তালাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুনির্ভর আইনের অনেক বিধানাবলীর কারণ অবোধগম্য হওয়া সত্ত্বেও

তাকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে পারেন, আর সত্যিকারের বিধানদাতার আইনকে বুঝি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে অসুবিধা হয়। কেউ যদি বলেন, আমাদের ধর্ম তো সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহলে বলবো, বুদ্ধিগ্রাহ্য তো বটেই, তবে বুদ্ধি সে পর্যন্ত পৌঁছাতো অত্যাবশ্যক নয়। যেমন, অনেক কিছুই দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝার রয়েছে, কিন্তু অন্ধরা তো সেগুলো বুঝতে পারে না। শরয়ী বিধানাবলীর হেতু বুদ্ধিমানদের কাজ। নবীগণ, কামেল ওলীগণ এবং অভিজ্ঞ আলেমগণকে এ বুদ্ধি দান করা হয়েছে। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে সে শক্তি নেই, আর কোন সনদ বা ডিগ্রী নিলেই সাধারণ মানুষের গণ্ডী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অসাধারণ হওয়া যায় না। দ্বীনের মূলনীতিসমূহ বুদ্ধিগ্রাহ্য। অর্থাৎ, যে কোরআন-হাদীসকে মানে না তাকে বুদ্ধিগত প্রমাণ দিয়ে তওহীদ ও রিসালত বুঝানো যেতে পারে। বাকী রইল, দ্বীনের শাখা-প্রশাখার কথা। যেমন, অমুক জিনিষ হারাম কেন? অমুকটা হালাল কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধি মাফিক হওয়া এই অর্থে জরুরী নয়। বরং এসব বিধি-বিধানকে শরীয়তে প্রমাণ সাপেক্ষে মেনে নিতে হবে। আর বিবেকও তো বলে, বাদশাহকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য ঐশী ও বুদ্ধিগত সব ধরণের প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে, তবে বাদশাহকে স্বীকার করে নেওয়ার পর তার প্রতিটি আদেশ-নিষেধের প্রমাণ তালাশ করা স্পষ্ট বিদ্রোহ বৈ নয়। আমি ভালোর জন্যই বলছি, প্রত্যেক হুকুমের হেতু খোঁজা এবং কারণ না জানা পর্যন্ত কোন হুকুম না মানা ধর্মঘর থেকে বেরিয়ে যাবার প্রধান ফটক। এ সমস্ত অশুভ মানসিকতা থেকে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হচ্ছি।

মোটকথা শরয়ী বিধি-বিধানকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া ওয়াজিব। হুকুমকে মেনে নেওয়ার পর তা থেকে উপকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হলে তার হেতু এমনিতেই বেরিয়ে আসে।

কোন এক রেল ভ্রমণে এক যুবকের সাথে আমার দেখা হয়। যুবকটি তার কুকুর সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। কথায় কথায় যুবকটি কুকুরের নানা উপকারিতা বর্ণনা করে একই প্রশ্নের অবতারণা করলো। আমি তাকে বললাম, কুকুরের মধ্যে এতসব গুণ তো আছে ঠিকই, তবে তার একটা দোষ সমস্ত গুণাবলীকে বিনষ্ট করে দিয়েছে, আর সে কারণেই ইসলামী শরীয়তে তাকে অপবিত্র বলা হয়েছে। যুবকটি সেই দোষ সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি বললাম, তাদের মধ্যে জাতীয় সহানুভূতি মোটেই নেই, স্বজাতীয়কে দেখে সে যে কি রূপ ধারণ করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতক্ষণ যাবৎ ইসলামী বিধানকে নিয়ে যুবকটি যে হাসি-ঠাট্টা করছিল তার উপযুক্ত ও বিশুদ্ধ জবাব পেয়ে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং খুশী হয়ে আমার সাথে একমত হয়ে গেল। অনেকে জবরদস্তিমূলকভাবে প্রয়োজন সৃষ্টি করে নিয়ে বলেন 'আমার বাড়ী পাহারার জন্য কুকুর পালন করি।' জনাব! আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের খবর রাখেন! নিছক চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে পেলে মনগড়া প্রয়োজনের দোহাই পাড়লে তা বৈধ হয়ে যায় না। চাকর-বাকর, দারোয়ান-পাহারাদার না থাকলে তো কুকুরের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এক-একটা কাজের জন্য যেখানে কয়েকজন করে চাকর রাখা হয় সেখানে কুকুর পালনের প্রয়োজনটা কোথায়? তেমনিভাবে শিকারের যাবতীয় অস্ত্র বন্দুক, তীর-ধনুক ইত্যাদি সহজ লভ্য হওয়া সত্ত্বেও কুকুর কেন পালতে যাবেন?

ছবি সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন, 'আমরা তো আস্ত ছবি তৈরী করি না বা রাখি না বরং কাঁধ পর্যন্ত ছবি করে থাকি। আর যে ছবিতে শরীরের এমন অংশ না থাকে যার অবর্তমানে শরীরে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব সে ছবি তো বৈধ।' তারাও অস্থানে বুদ্ধি প্রয়োগে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। আসল কথা হচ্ছে, দেহের এমন অংশ ছবিতে না থাকলে তা হারামের পর্যায়ে এই কারণে পড়ে না যে, তখন সেই ছবিকে আর ছবি বলে মনে হয় না বরং ঝোপ-ঝাড় বলে মনে হয়। চেহারা দিয়েই ছবির পরিচয়, চেহারাই অবশিষ্ট দেহের প্রমাণ, কাজেই যে ছবিতে চেহারা রয়েছে সে ছবি বৈধ হতে পারে না। অনেকে নিষেধকারকে প্রতিবাদের স্বরে জিজ্ঞেস করেন,- জনাব! টাকায়ও তো ছবি রয়েছে, টাকা আপনারা ঘরে রাখেন কেন?' তাদের এ বক্রোক্তির কোন মানে হয় না। টাকা তো অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, আর প্রয়োজনে শৈথিল্য রয়েছে। অন্যরা শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে ছবি লাগান। এতে আর তাতে কত পার্থক্য! অনেকে ফটোগ্রাফকে ছবি থেকে ভিন্ন ভাবেন। তারা যুক্তি দেখান ঃ ফটোগ্রাফে আপনা-আপনি ছবি হয়ে যায়, কেউ তৈরী করতে হয় না ; কী আশ্চর্য গবেষণা! ছবি তোলার সরঞ্জাম

সংগ্রহ করা, ছবি প্রার্থীর সামনে ক্যামেরা রাখা, এগুলো ছবি প্রস্তুতের কাজ নয় তো কি?

দশম অনুচ্ছেদ

পোশাক-আশাক চালচলন, আহার-বিহার ইত্যাদিতে বিধর্মীদের বেশ ধারণ করাও একপ্রকার ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আহমদ ও আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابو داود)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,—'যে কেউ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির অনুকরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আবিল আস বর্ণনা করেন, আমার গায়ে কুসুম রঙের দু'টুকরো কাপড় দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, 'এ কাপড় নিঃসন্দেহে কাফেরদের পোশাক, একে পরিধান করো না।'

আবু দাউদ বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সাঃ) দশটি জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আজমীদের অনুকরণ করে কাঁধে রেশমের টুকরা লাগানো। বুখারী মুসলিম শরীফেও বর্ণিত অপর এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়ত করেন, রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা খেযাব ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের বিরোধিতা কর।' এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের অনুকরণ করা হারাম। কোন কোন হাদীসে তাদের মতো পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে, কোন কোন হাদীসে তাদের রঙে রঞ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে আর কোন কোন হাদীসে তো সামগ্রিক ব্যাপারে তাদের অনুকরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান কালে অনেক লোকের

মনে এ ব্যাপারটি বিন্দুমাত্র দাগ কাটে না। কোন কোন সাহেব এইসব হাদীসকেই অস্বীকার করে বসেন, হাদীসের কোন মূল্যই নেই যেন তাদের কাছে। কি স্পর্ধা! কি অনাচার! যে শিক্ষার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশও সংকলক তথা সংকলনের সময়কার বর্ণনাকারী থেকে শুরু করে রসূলে আকরাম (সাঃ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ বর্ণনা পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত এবং সকল যুগের প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জন্ম-মৃত্যু, চালচলন, শিক্ষক-ছাত্র, ধার্মিকতা, সত্যবাদিতা, স্মরণশক্তি, আক্বীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা ইত্যাদি যাবতীয় অবস্থার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই এক-একটা হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। আর কোন কিছুতে সামান্য বেশ-কম বা শোবা-সন্দেহ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে তা প্রত্যাখান করা হয়েছে। এত কিছু যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে বিষয় সংকলিত হয়েছে, তাকে নির্ভরযোগ্য মনে না করে, হাজারো রকমের সত্য-মিথ্যার সমন্বয়ে লিখিত ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতিটি অংশকে যেন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে ধারণা করা হয়। অথচ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ অনেক কথাই ঐতিহাসিকগণ আন্দায-অনুমানের উপর ভিত্তি করে লিখে ফেলেছেন। অনেক ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ এত বেশী মতবিরোধ করেছেন যে, এর মধ্যেকার অসংগতি দূর করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকদের ঈমান, সত্যবাদিতা ও স্মরণশক্তি কোনটাই মুহাদ্দিসগণের সমপর্যায়ের নয়। তারপরও বে-ইনসাফির তো কোন সীমা আছে!

কেউ কেউ বলে থাকেন, অনুকরণ সম্পর্কিত হাদীসগুলো দুর্বল।' বড় আশ্চর্যের কথাবার্তা! যারা দুর্বল হাদীসের সংজ্ঞাই জানে না তারা আবার কোন্‌টা সবল কোন্‌টা দুর্বল তা নির্ধারণ করে। আচ্ছা জনাব একটা হাদীস হলে না হয় তা দুর্বল বলেই মেনে নিতাম কিন্তু এ অসংখ্য হাদীসসমূহকে কি একেবারে বিনা প্রমাণেই দুর্বল বলে ফেলবো? ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অনুকরণের বিষয়টা তো আমরা খোদ কোরআন শরীফ দ্বারাই সমাধান করে নিতে পারি। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ۝

—হে ঈমানদারগণ! পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।'

অপর আয়াতে আছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۔ (البقرة ٢٠٤)

—'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না।'

একটু কষ্ট স্বীকার করে এ আয়াতদ্বয়ের তফসীর ও শানে নুযূল পাঠ করার অনুরোধ করছি। দ্বিতীয় আয়াতে ব্যবহৃত 'কাফ' বর্ণ যে অনুরূপ বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তা যদি জানেন তাহলে নিশ্চিত হতে পারবেন যে কোরআন শরীফে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তাহলে কি এখন কোরআনকেই দুর্বল প্রতিপন্ন করার চিন্তা-ভাবনা করবেন? আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন, অনেকে তো এ ব্যাপারে বুদ্ধিগত সন্দেহ করে বসেন। তারা যুক্তি দেখান, অনুকরণ যদি হারামই হয় তাহলে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দাও, চেহারা থেকে নাক কেটে ফেল ইত্যাদি ইত্যাদি, কেননা এসব দিক দিয়েও তো অন্য জাতির সাথে আমাদের মিল রয়েছে। ব্যাপারটা তো এরকম হলো, যেমন, কেউ ব্যভিচার হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হয়ে বললো, 'আরে সাহেব! ব্যভিচার যদি হারাম হয় তাহলে তো বিয়েকেও হারাম বলতে হয়, কেননা, উভয় কর্মই মূলতঃ অনুরূপ। কথা হচ্ছে, যে বিষয়ের উপর যার দখল নেই সে বিষয় আলাপ করা তার পক্ষে সমীচীন নয়। খামাখা নিজেকে অপদস্থ করার কোন মানে আছে? এটা শরীয়তের মাসআলা, শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অনুকরণ হারাম হওয়ার কারণ প্রথমে ভালভাবে জেনে নিয়ে অতঃপর যা বলার থাকে বলুন।

এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য হচ্ছে এই যে, যে বিষয় স্বয়ং নিন্দনীয় ও গর্হিত সে বিষয়ে অনুকরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন, টাখনু ঢেকে প্যান্ট-পাজামা পরা। এতে যদি কোন বিধর্মীর অনুকরণ নাও হয়, তবুও টাখনুর নীচে নামার কারণে তা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা ইতিপূর্বে এসেছে। অনুকরণ দোষে দুষ্ট হয়ে তা আরো পাপ বাড়ায়। আর খোদ বিষয়টি নিন্দনীয় ও গর্হিত না হলেও তা যদি অন্য ধর্মাবলম্বীকে অনুকরণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় অথবা বিষয়টি যদি ভিন্ন জাতির প্রচলিত বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্ম হয় তাহলে এমন বিষয়গুলিও নাজায়েয হবে। আর কোন হালাল কর্ম সম্পাদনে যদি

অন্য জাতির অনুকরণের উদ্দেশ্য না থাকে এবং তা যদি অন্য জাতির বৈশিষ্ট্যও না হয়, তাহলে এমন কাজ করা জায়েয হবে। শরীয়তি বিধি-বিধান ও মূলনীতিসমূহের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলে উপরোক্ত নীতিমালাকে সত্যায়ন করা কষ্টকর হবে না। এখন আর নাক কেটে ফেলা ও আহার পরিহার করার মত অদ্ভুত সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। সাধারণ মানুষ যে সমস্ত নিষিদ্ধ অনুকরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে, উপরোক্ত আলোচনা থেকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। প্রথমতঃ যে সমস্ত জিনিষে অনুকরণ করা হয় সেগুলো একটা জাতির বৈশিষ্ট্য। একারণেই বিজাতীয় বেশধারী স্বদেশীয়দেরে দেখে সাধারণ জনগোষ্ঠী ক্ষেপে উঠে। আর কোন জাতির বিশেষ ধরণের রীতি-নীতি গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোন জাতির জাতীয় রীতিকে কেউ যদি জোর করে সকল দেশ ও সকল জাতির সাধারণ প্রচলিত রীতি বলে দাবী করে বসেন তাহলে তা হবে নিতান্তই অমূলক ও অযৌক্তিক। শুধু তাই নয় একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে, এসব রীতি জনসমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়নি যে, এখন এসবকে কোন বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা করা হয় না। কোন দেশের শাসকগোষ্ঠী বা শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সবাই তাদের পুরানো রীতিকে আঁকড়ে থাকে। কোন জাতির বৈশিষ্ট্যকে তাদের বৈশিষ্ট্য নয় বলে আপততঃ স্বীকার করে নিলেও এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, যিনি সে রীতিকে গ্রহণ করেন তিনি অনুকরণ প্রীতিতেই তা করে থাকেন। অনেক সময় মনের অজান্তে স্বীকার করে নিয়ে অনেকে বলে থাকেন, 'জনাব! এ তো শাসকদের রীতি, একে দেখলে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, তাই তো একে গ্রহণ করে নিয়েছি।' মোটকথা, স্বীকারোক্তি ও অকাট্য দলীল দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই অনুকরণের উদ্দেশ্য থাকলেই তা হারাম হয়ে যাবে।

অনেকে বলেন, আমরা তুর্কী টুপী পরতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি, এখন এটা সবাই পরে, এ টুপী পরা এখন আর কোন প্রশংসনীয় কাজ নয়, কাজেই তুর্কী টুপী পরলে অনুকরণ হবে না।' অনেকে আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলেন 'আচ্ছা না হয় টুপীতে অনুকরণ হবে মনে করে তুর্কী টুপী

পরা ত্যাগ করলাম। এতে করে তো একটা পাপ কমলো, বাকী যত ব্যাপার অনুকরণ করা হয় সেগুলো তো যথা তথা রয়েই গেল। সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার তো কোন উপায় হলো না।' আরো অনেক অপদার্থের মুখে এ ধরণের নানা শোবা–সন্দেহ প্রকাশ পেয়ে থাকে। উপরোল্লেখিত নীতি–মালাকে পুংখানুপুংখরূপে উপলব্ধি করে নিলে এসব শোবা–সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। সন্দিগ্ধজনের উদ্দেশ্যে এখানে আরো দু'টো প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করছি। প্রথম প্রমাণ শাস্ত্রীয়—এটা সবার কাছে সমান গ্রহণযোগ্য আর তাহচ্ছে রসূল (সাঃ)–এর নীতি নির্ধারক ঘোষণা 'ইসলামে রুহুবানিয়্যাত (খ্রীষ্টিয় বৈরাগ্যবাদ)–এর স্থান নেই'।

ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে বক্তাগণকে প্রায়ই এই হাদীসটির উদ্ধৃতি দিতে শুনা যায় মধ্যপন্থা পরিত্যাগ করে নিজেকে অত্যধিক যাতনা দেওয়া নিষিদ্ধ বুঝাবার জন্য 'রুহবানিয়্যাত' শব্দ ব্যবহারের রহস্য কি? 'রুহবানিয়্যাত' এর মানে কি? এটা কি 'রহব' ধাতু থেকে উদ্ভূত নয়? রাহিব (রহব–এর কর্তৃকারকীয় রূপ) কাকে বলে? খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীকে না অন্য কাউকে? 'নিজের উপর অত্যধিক কড়াকড়ি করো না' বলে দিলেই তো চলতো, সেখানে আবার 'ইসলামে রাহিব হওয়া বৈধ নয়' বলার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নমালাকে সামনে রেখে সামান্য চিন্তা করলেই বুঝতে দেরী হবে না যে, হাদীসখানাতে সীমাতিক্রম ও অতিরিক্ত কড়াকড়ি নিন্দনীয় হওয়ার কারণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে রুহবানিয়্যাত শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে, এতে করে রাহিবদের অনুকরণ করা হয়। মুসলমান হয়ে রাহিব হতে যাবে কেন? ভিন্ন জাতির অনুকরণ হারাম ও নিন্দনীয় হওয়ার আর কি প্রমাণ চান?

দ্বিতীয় প্রমাণ যুক্তিপ্রসূত। যুক্তিপূজার অপ্রতিবন্ধ প্রবণতার ফলশ্রুতিতে এ প্রমাণ প্রথমটি থেকেও অধিক গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করি। মনে করুন, অনুকরণ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের ঘোর প্রতিবাদী কোন ভদ্রলোককে যদি পূর্ব অবগতি ছাড়াই ভর মাহফিল স্ত্রীলোকের জামাজোড়া গায়ে পড়তে অনুরোধ করা হয়, তাহলে নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে, ঐ অনুরোধকারীকে হাতের নাগালে ফেলে ভদ্রলোক জীবন্ত ছাড়বেন না। কেন জনাব, অনুকরণের ব্যাপারটি যদি এতই অযৌক্তিক বলে মনে হয়, তাহলে এখানে স্ত্রীলোকের

বেশ পরতে অনুরোধ করতেই রেগে চটে সারা হয়ে গেলেন কেন? সামান্য পার্থক্যের কারণে অন্য মুসলমানকে অনুকরণ করতেই যখন এতই নারাজ, তখন ধর্মীয় বিরোধের কারণে কাফেরদের অনুকরণ করতে তো আরো বেশী অসন্তুষ্ট আরো বেশী লজ্জা হওয়ার কথা। প্রকাশ থাকা অবশ্যক যে, উর্দী পরা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটা ক্ষমতার প্রতীক, এতে কোন জাতির অনুকরণ করা হয় না।
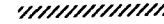
দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিয়ে-শাদীতে প্রচলিত অধিকাংশ বরং প্রায় সকল রীতি-নীতিই কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সকল কুপ্রথার চর্চা চলে। এমনকি অনেক বড় বড় প্রভাবশালী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গকেও সমাজে প্রচলিত এসব কুসংস্কারে গা ভাসিয়ে দিতে দেখা যায়। সাধারণ লোকজনের ধারণা এসবে তো গোনাহর কিছুই নেই। নারী-পুরুষ একই অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদি করে থাকে, এতে শরীয়ত বিরোধী তো কিছু নেই, গান-বাজনাও হয় না, তাহলে এসবকে নিষেধ করার কি কারণ থাকতে পারে?

এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণার একমাত্র কারণ হচ্ছে, সমাজের রক্তে মাংসে মিশে যাওয়া এসব কুপ্রথা চিন্তা ও বোধশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে বৈধ কিছু কিছু কাজের প্রতি লক্ষ্য করে এসবের আড়ালে যেসবা অনাসৃষ্টি ও অপকারিতা বিদ্যামান, সেগুলির দিকে নজর পড়ে না। উদাহরণতঃ বলা যায়, কোন অবুঝ শিশু মিষ্টির স্বাদ ও রঙে মুগ্ধ হয়ে মনে করে এটাতো বড়ই ভালো জিনিস। আর যেসব অন্তর্নিহিত ক্ষতিকারক দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে তার পিতা-মাতা তাকে মিষ্টি খেতে নিষেধ করেন সেদিকে সে খেয়ালই করে না, বরং কল্যাণকামীদের সে দুশমন ভাবে। অথচ এসব রসূমে যেসকল অপকারিতা বিদ্যমান তা খুব একটা বেশী গোপনীয় নয়, বরং এসবের ক্ষতি সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই পূর্ণ অবহিত, অনেক ক্ষেত্রে স্বীকারও করেন অনেকে এবং এ কারণে অনেক সময় অনেক দুর্ভোগও পোহাতে হয়। তারপরও আগুনে পতঙ্গ পতনের মত সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসবে লিপ্ত হয় এবং সৎ উপদেশ দানকারীগণ প্রায়ই তাদের কাছে উপেক্ষিত

হন। সন্তান জন্মগ্রহণের সময়কার একটা রীতিও এই পর্যায়ভুক্ত। এর নিম্নলিখিত দোষণীয় দিকগুলো সহজেই লক্ষ্যণীয়।

এক—প্রথম বাচ্চা প্রসব করার সময় পিতার বাড়ীতে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা বর্তমানে অবশ্য করণীয় বলে মনে করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় প্রসবের সময় একেবারে ঘনিয়ে আসলে শ্বশুরালয় থেকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সন্তান সম্ভবা মহিলা সেই ভ্রমণ কষ্ট সহ্য করতে পারবে কিনা সেদিকে একটুও লক্ষ্য করা হয় না। এতেকরে গর্ভবতী আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানেরও ক্ষতি হয়। অনেক সময় তা দীর্ঘদিন যাবৎ মা ও সন্তানের রোগভোগের কারণ হয়। গর্ভাবস্থায় অসাবধানতার দরুন অধিকাংশ শিশু রোগাক্রান্ত হয় বলে অভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন। মোটকথা, এ অযথা পরিশ্রমের ফলে একসাথে দু'টি জীবন বিপদাপন্ন হয়। অধিকন্তু এ অনাবশ্যক রীতিকে এমনভাবে অনুসরণ করা হয় যে, তা যেন এক অলংঘণীয় কর্তব্য—স্বউদ্ভাবিত এক নতুন শরীয়ত। বিশেষ করে, এ কাজের পেছনে যখন এমন বিশ্বাস ক্রিয়া করে যে, একে লংঘন করলে কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বা বদনাম হবে। ক্ষতি হয়ে যাওয়ার বিশ্বাস তো শিরকের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাউকে উপকারী বা অপকারী বলে বিশ্বাস করার শামিল। এ কারণেই হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে—'কুলক্ষণ বলতে কোন কিছুই নেই'। অপর এক হাদীসে টুটকাকে শিরক বলা হয়েছে। সমাজের কাছে সুনাম ক্ষুন্ন হবে বলে আশংকা করা একপ্রকার অহংকার। কোরআন ও হাদীসে অহংকার হারাম বলে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। মানসিক ভাবে ক্ষতি বা অপবাদের আশংকায় শংকিত হওয়ার দরূন অনেক অশান্তি ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

দুই—কোন কোন স্থানে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রসবের আগে কুলা-ডালায় কিছু পরিমাণ তরি-তরকারী ও পাঁচ সিকি পয়সা রাখা হয়, ইহা প্রকাশ্য শিরকী কর্মকাণ্ড।

তিন—সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর পরিবারের সদস্যাগণ ছাড়াও মহল্লাবাসী মহিলাগণ চাঁদা আদায়ের মত কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করে ধাত্রীকে দিয়ে থাকে। তা আবার ধাত্রীর হাতে না দিয়ে টুকরীতে ঢেলে দেওয়ার নিয়ম।

হাতে না দিয়ে টুকরীতে দেওয়ায় এ নিয়মটি যে কি ধরণের বুদ্ধির কাজ তা বুঝা মুশকিল। মনে করলাম টুকরীতে না দিয়ে হাতেই দিল, কিন্তু তবুও তো ব্যাপারটা বড়ই ঘোলাটে যে, দানকারিনীগণ এ কাজ কি উদ্দেশ্যে করে থাকে? যখন এ কুপ্রথার প্রচলন শুরু হয় তখনকার কথাতো জানা নেই–কেন কি উপকার লাভের জন্য একাজ করা হতো? হতে পারে, নবজাতকের আগমনে আত্মীয়–স্বজন সবাই খুশী হয়ে ধাত্রীকে কিছু পুরস্কার দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, শিশুর জন্ম উপলক্ষে কেউ উল্লাসিত হোক আর নাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, ধাত্রীকে এনাম দিতেই হবে। আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে কোন কোন মহিলা নিতান্ত অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে এনাম নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। কোন অজুহাতে তা থেকে অনুপস্থিত থাকলে তো সারা জীবন এর জন্য কথা শুনতে হয়। আর উপস্থিত হলেও সামান্য জিনিস সাথে করে নেওয়া মহিলাদের কাছে অত্যন্ত অপমানকর ও লজ্জাকর ব্যাপার। অর্থাৎ, যেতে তো হবেই, সাথে সাথে মোটা অংকের দানও করতে বাধ্য। দাওয়াত দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে লুণ্ঠন করা—এ তো প্রকাশ্য অত্যাচার। খুশীর পরিবর্তে অনেক সময় তা অনেকের উপর ভার–বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তবু এ টেক্স ফাঁকি দেওয়ার জো নেই। সরকারী কর আদায়ে অনেক সময় মাসেক দেরী হয়ে থাকে কিন্তু এ করআদায়ে এক মিনিটও ধৈর্য ধরা হয় না। এমনকি নির্ধারিত সময়ের আগেই তা আদায় করা ওয়াজিব। এইভাবে, এই উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা, সংগ্রহকারী বা পরিবারের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক এইসব জিনিস গ্রহণ ও দান করা ইত্যাদি কতটুকু সঙ্গত হবে ভেবে দেখেছেন কি? এ ক্ষেত্রে দাতাদের উদ্দেশ্য থাকে লোকের প্রশংসা কুড়ানো এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখানো।

এ ব্যাপারে হাদীসে আছে,—'যে ব্যক্তি সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কাপড় পরবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে অপমানকর পোশাক পরিধান করাবেন।' এ থেকে বুঝা গেল, সুনামের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা জায়েয নয়। বলাবাহুল্য, এই কাজে তো নিয়ত একটাই থাকে যে, দর্শকগণ আমার দান দেখে আমার প্রশংসা করে বলবে 'অমুক এটা দিয়েছেন'। নতুবা, বদনাম

হবে, লোকে বলবে, 'এমন সামান্য জিনিস নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল?'

এ তো গেল দাতাদের ব্যাপার। এখন গ্রহীতাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। হাদীসে আছে, আন্তরিকভাবে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত কোন মুসলমানের সম্পদ অন্য কারো জন্য হালাল নয়।' কেউ যদি অসম্মত হয়ে ও বাধ্য হয়ে কিছু দান করে তাহলে গ্রহীতার পাপ হবে। দাতা যদি সম্পদশালী হয় এবং দান করতে যদি তাকে বাধ্য করা না হয়, তবুও এ দানে যেহেতু সম্মান ও অহংকার প্রকাশ করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে সেহেতু এ ধরণের লোকের দাওয়াত বা দান গ্রহণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আত্মসম্মান বা অহংকার প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে দাওয়াত দেয় তার দাওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে করে দাওয়াতকারীর পাপ–কর্মে সহায়তা করা হয় এবং পাপের সহায়তা করা পাপ। মোট কথা, এ ক্ষেত্রে দান গ্রহীতাও পাপ থেকে রক্ষা পায় না। অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হলো, পরিবারের লোকজনও এ সমস্ত দাতাদেরে দাওয়াত করে আনার অপরাধে পাপী হবে। মোটকথা, এটা এমন একটা রীতি যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাপী করে, এ রীতি সাধারণতঃ ঋণ করে হলেও পালন করতে হয়। উপরোক্তগুলি ছাড়াও এতে আরো অনেক অপকারিতা রয়েছে। 'আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও মূল বিষয়ের মতো'—এই নীতি ভিত্তিতে বলা যায় যে এই চাঁদা আদায়ের জন্য ঋণ করা অবৈধ। এই চাঁদা আদায় করার সময় কারো অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ সচ্ছল অবস্থায় কেউ যদি আগে–ভাগে আদায় করতে চায় তাহলে তা লওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ সামর্থ্য থাকুক আর না–ই থাকুক এ দান করতেই হবে। অর্থাৎ, তিন পরিস্থিতিতেই শরীয়তি আইনের বিরোধিতা করা হয়। কাজেই দানের এ প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ অবৈধ।

চার—অতঃপর ধাত্রী কিছু পরিমাণ তরি–তরকারী কোলে নিয়ে সারা মহল্লা ও আত্মীয়–স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নবাগতের সালাম পৌছায়। যাকেই এ সংবাদ পৌছায় সে–ই কিছু তরি–তরকারী দান করে। এই প্রথায়ও তৃতীয় রীতির অনুরূপ ধারণা ও উদ্দেশ্য কাজ করে।

পাঁচ—বাড়ীতে কাঙ্গালী ভোজ দেওয়া হয়, যাকে 'ছত্রিশ থাম্বা' বলা

হয়। কাঙ্গালদের মধ্যে পরিচারক-পরিচারিকারাও থাকে। এদেরে অধিকার বা পুরস্কার হিসাবে খাদ্য-দ্রব্য দিলে তাতে কিছু আসে যায় না বরং এটা তো ভালো কাজ। তবে এ ক্ষেত্রেও নিজের সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয় করতে হবে। পরের নিন্দাবাদের ভয়ে খেয়ে না খেয়ে, সুদের উপর টাকা ধার নিয়ে, সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে হলেও চাকর-বাকরদেরে খাওয়াতে হবে—এমন তো ঠিক নয়। যে কেউ এরূপ কাজ করবে সে অহমিকা প্রকাশ, বিনা প্রয়োজনে ধার নিয়ে অপরের ধন নষ্ট করা, সুদ প্রদান-যার পাপ সুদ গ্রহণের সমান, অহংকার ও আত্মগর্ব প্রকাশ করা এবং অপচয় করা ইত্যাদি যেসব কাজ অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে সেগুলি করার অপরাধে গোনাহগার হবে।

এতো গেল চাকর-বাকরদেরে পুরস্কার দানের কথা। কোন কোন কাঙ্গাল এমন যে, তাদের দ্বারা উপকারও হয় না, না তারা কোন কাজে লাগে আর না তাদের কোন প্রয়োজন আছে তবুও তারা যেন উত্তমর্ণ সেজে অধমর্ণের কাছে থেকে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে আসে। অন্য কেউ আহার করুক আর না করুক তাদের খাওয়াটা দিয়ে দিতে হয়। এ স্থলেও দাতা ও দান গ্রহীতা উপরে বর্ণিত কারণে গোনাহগার হবে। তাছাড়া, কাঙ্গালদের উদ্দেশ্যে ভোজ দেওয়া যেহেতু ওয়াজিব নয় বরং একটা সদাচার আর কাউকে সদাচার করতে বাধ্য করা বা চাপ সৃষ্টি করা হারাম। বলা বাহুল্য, এই কুপ্রথাকে প্রচলিত রাখা হারাম কাজে সহায়তা করার নামান্তর এবং হারামের সহায়তা করাও হারাম।

ছয়—সদ্যপ্রসবা মহিলার শ্বশুর বাড়ীতে লোকমারফত চিঠি পাঠিয়ে নবজাত শিশুর আগমন সংবাদ জানানো হয়। অথচ এই সামান্য সংবাদের জন্য একজন মানুষ না গিয়ে একটা টেলিগ্রাম বা একখানা কার্ড লিখে পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। শ্বশুর বাড়ীর লোকজন এই সংবাদদাতাকে নানা ধরণের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এ পুরস্কার প্রদানকে ফরয ইবাদতের চাইতেও অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ কাজেও প্রশংসিত হবার আকাংখা এবং নিন্দিত হবার ভীতি মনে উদ্রেক হলে তা নাজায়েয হবে।

সাত—জন্মের চল্লিশতম দিনে শিশুকে গোসল করানোর সময় মহল্লাবাসি সকল মহিলা জড়ো হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে এবং রাতের বেলায় ঘরে ঘরে দুধ-চাউল বিতরণ করা হয়। কি অভিনব প্রথা! জোর করে কারো ঘরে দাওয়াত খাওয়া কি ধরণের ভদ্রতা? মেহমানদের জবরদস্তি আর মেযবানদের প্রশংসিত হবার আকাংখা ও নিন্দাবাদের ভয় এই প্রথা নিষিদ্ধের কারণ হিসাবে যথেষ্ট দুধ-চাউল বিতরণ করে মহল্লার মরুব্বীদের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়োজনটা কি? এ ক্ষেত্রেও সমাজে প্রভাবশালী হবার প্রবণতা ক্রিয়া করে আর এ কারণেই তা নিষিদ্ধ।

আট—বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ থাকে, এমনকি নিয়মিতভাবে নামায আদায়কারিনী অনেক মহিলাকেও এ সময় নামাযের প্রতি অবহেলা করতে দেখা যায়। অথচ শরীয়তের বিধানে নেফাসের সর্বনিম্ন পর্যায় নির্ধারিত নেই। বরং বলা হয়েছে, যখনই নেফাসের প্রবাহ বন্ধ হবে তখনই গোসল করে বা গোসল ক্ষতিকারক হলে তায়াম্মুম করে নিয়ে নামায পড়া শুরু করতে হবে। শরীয়তসম্মত অজুহাত ছাড়া এক ওয়াক্ত নামায না পড়া বড়ই গোনাহর কাজ। এমন ব্যক্তি ফেরাউন, হামান ও কারুণদের সাথে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

নয়—কোলের শিশুকে নিয়ে বধু যখন বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা হয় তখন শ্বশুর বাড়ীর সকলের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে থাকেন। শ্বশুর বাড়ী পৌছার সাথে সাথে সেখানকার সকল মহিলাগণ বধু কি নিয়ে আসলো তা দেখার জন্য জড়ো হয়ে এক ওয়াক্তি সে ঘরে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যায়। এ সকল কাজ এত নিয়ম মাফিক ও রীতিবদ্ধ ভাবে করা হয় যে, ফরয কাজও এত গুরুত্ব দিয়ে করা হয় না। তদুপরি, একাজ করলে অহমিকা প্রকাশ পায়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। শিশুর জন্মকালে সুন্নতসম্মত কার্যকলাপগুলি হলো, জন্মের পরপরই শিশুকে গোসল করিয়ে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত দেওয়া, অতঃপর কোন পরহেযগার মুরুব্বীর চর্ব্বিত খেজুর ইত্যাদি শিশুর তালুতে লাগিয়ে দেওয়া। এছাড়া অন্যান্য যতকিছু আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে সবই অযথা, অযৌক্তিক ও মাকরূহ।

এছাড়া অন্যান্য যে অযথা প্রথাসমূহ প্রচলিত রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ উপযোগী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ছেলে-মেয়ের আক্বীকায়ও অনেক ধরণের কুপ্রথা প্রচলিত আছে। আক্বীকার দিন ছেলে হলে দুই ছাগল এবং মেয়ের জন্য এক ছাগল যবেহ করা, যবেহকৃত জন্তুর গোশত কাচা অথবা রান্না করে বিতরণ করা, শিশুর মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজনের সমান রৌপ্য দান খয়রাত করা ইত্যাদি কাজ সুন্নত ও মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত প্রথাসমূহ ইসলামী শরীয়তে মূল্যহীন।

এক—যে বাচ্চার আক্বীকা করা হয় তার মাথার চুল কামানোর পর মহল্লাবাসী পুরুষগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ মিলে একটা বাটিতে চাঁদা সংগ্রহ করেন। এ চাঁদা সংগ্রহ করা পরিবারের কর্তার একটা পবিত্র দায়িত্ব মনে করা হয় এবং নাপিতকে ঐ সংগৃহীত চাঁদা দেওয়া হয়। এ প্রদানকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, ঐ সময় নিজের কাছে না থাকলে সুদে টাকা ঋণ নিয়ে হলেও তা আদায় করতে হয়। এ কর্তব্য পালনের বেলায় ইসলামী শরীয়তের বিধান লংঘিত হলেও যেন কিছু আসে যায় না। আসলে একাজের পেছনেও প্রশংসিত হবার লোভ আর নিন্দণীয় হবার ভয় ক্রিয়া করে থাকে। ঋণ গ্রহণ ও দানের পদ্ধতিটাও অভিনব, প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ঋণ নিতেই হবে। তা আবার যখন ইচ্ছা তখন পরিশোধও করা যায় না, বরং কেউ যদি তা শোধ করতে চায় তাহলে বলা হয়—'না এখনই দিতে হবে না বরং আমাদের এখানে কোন অনুষ্ঠানে তা দিয়ে দেবেন। বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করাকে হাদীসে তিরস্কার করা হয়েছে, অযথা ঋণ গ্রহণ নিঃসন্দেহে রসূল (সাঃ)-এর আদর্শের স্পষ্ট বিরোধিতা। কোন ব্যক্তি যদি অন্যের হক আদায় করে দিতে চায়, তাহলে অন্য কারো পক্ষে তাকে দায়মুক্ত হতে না দেওয়া বা অন্তরায় সৃষ্টি করা অত্যন্ত দোষণীয় কাজ। ঋণ দান ও গ্রহণের এ গর্হিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে উপহার প্রদানও দোষণীয় কাজ হয়ে যায়।

দুই—আক্বীকার সময় বোন-ভাগ্নিকে পুরস্কৃত করার প্রথায় কাফেরদের অনুকরণ ছাড়াও নিম্নোক্ত অপকারসমূহ রয়েছে—

(ক) পুরস্কার দাতার সামর্থ্য না থাকা সত্বেও অনেক সময় সমাজের চোখে নিন্দিত হবার ভয়ে এ উপহার দিয়ে থাকে। এখানে দাতার আন্তরিকতা অনুপস্থিত। লোক দেখানো ও অহম প্রকাশের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা গোনাহর কাজ।

(খ) দান তো একটা সদাচার আর কাউকে দান করতে বাধ্য করা শরীয়তের খেলাফ। দান না করার কারণে কাউকে তিরস্কার করা বা বংশের সুনাম নষ্টকারী ভাবাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বাধ্য করার শামিল। দাতা সন্তুষ্ট হয়ে দিলেও এতে সুনাম অর্জনের আকাংখা অবশ্যই বিদ্যামান থাকে—যা কোরআন-হাদীসের মর্মানুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(গ) এতেও হালুয়া-রুটি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়—যা অযৌক্তিক, এবং প্রশংসিত হবার অভিলাষ ও লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকার কারণে অবৈধ।

বাচ্চার দাঁত উঠার সময়ও এ ধরণের কুপ্রথা পালন করা হয়। এ সময় মহল্লাবাসীদের মাঝে খাদ্য-দ্রব্য বিতরণ করা হয়। এ প্রথা পালন না করাকে ফরয-ওয়াজিব পালন না করার চেয়ে বেশী দোষণীয় মনে করা হয়। তেমনি ভাবে বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর সময় মহল্লার মহিলাগণ জড়ো হয়ে অযথা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে খেজুর বিতরণ করা ইত্যাদি কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এর কোনটাই শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাচ্চাদের হাতে খড়ি দানের আনুষ্ঠানিকতাও এক ধরণের কুসংস্কার। এতে নিম্নোক্ত অপকারসমূহ নিহিত ঃ—

এক—চার বৎসর চার মাস চার দিন বয়স হলে হাতে খড়ি দানের যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে তা ভিত্তিহীন। মাজমাউল বাহার কিতাবের পরিশিষ্টে

শায়খ আলী মুত্তাকী তার ফতওয়ায় এই প্রথার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। জনসাধারণ একে শরয়ী বিধানের মতো অপরিহার্য মনে করে, ফলে আক্বিদাগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এভাবে শরীয়তে নতুন এক বিধান আবিস্কার করা হয়—যার অবৈধতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

দুই—হাতে খড়ি উপলক্ষে শিরনী বিতরণ না করাকে দোষণীয় ও মানহানিকর ধারণা করা হয়। খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এ শিরণী বিতরণ করা হয় না, কেননা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণের তো আরো অনেক পন্থা আছে, সেগুলো কখনো অবলম্বন করা হয় না। মিসকীন খাওয়ানো, গরীবদের মধ্যে ভাত-কাপড় বিতরণ করা, মসজিদ-মাদ্রাসায় দান-খয়রাত করা, অভাবগ্রস্থ অবস্থায় মুখে শোকরিয়া আদায় ইত্যাদি কোন পন্থায়ই বুঝি মন ভরে না। সারা জীবন এ একই রীতির অনুসরণ কুসংস্কার বৈ নয়। লোকের নিন্দাবাদের ভয়ে করলে তাতে লোক দেখানো ও অহংকার হয়, সওয়াব হয় না।

তিন—কোন কোন ঐশ্বর্যশালী লোক রূপার দোয়াত কলম দিয়ে রূপার শ্লেটে লিখিয়ে বাচ্চার হাতে খড়ি দেন। নিজে রূপা ব্যবহার করা বা অপরকে দিয়ে ব্যবহার করানো সবই হারাম।

চার—কোন কোন পরিবারে এ সময় বাচ্চাকে রেশম বা জরী নির্মিত অথবা কুসুম বা জাফরানী রঙের কাপড় পরানো হয়, এটাও একটা স্বতন্ত্র গোনাহ।

পাঁচ—এ সময় গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানোকে ফরযের চেয়েও অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিজের খাদ্য থাকুক আর নাই থাকুক তাদেরটা দিয়ে দিতে হবে। জোর করে কারো সম্পদ গ্রহণ করা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছু দান করার অপকারিতা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে

মাজমাউল বাহার, শরহে শিরআতে ইসলাম ও ইবনে সুন্নী কিতাবে বলা হয়েছে, বাচ্চা কথা বলতে শুরু করলে প্রথমেই তাকে কলেমা শিখানো উচিত। শরহে শিরআতে ইসলামে বাচ্চাদের

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ

الْكَرِيْمِ ۔ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۔ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۔

থেকে সূরা মুমিনুন-এর শেষ পর্যন্ত এবং

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

থেকে সূরা হাশরের শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েত মোতাবেক

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ع

শিক্ষাদান করতে বলা হয়েছে। ইবনে সুন্নী (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর রীতিও এটাই ছিল। কোন নির্ভরযোগ্য বুযুর্গের নিকট বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে বিসমিল্লাহ্ পড়ানো, এই নিয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ খুশী হয়ে গোপনে কিছু দান-খয়রাত করা ইত্যাদি ভালো কাজ। এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় কুসংস্কার পরিহার্য।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

খৎনা সম্পর্কিত যেসব রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে সেগুলিও কুসংস্কার। যেমন ঃ—

এক—এ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য চিঠি বা লোক মারফত খবর দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জড়ো করা হয়—যা সুস্পষ্টভাবে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। মুসনাদে আহমদে হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন এক ব্যক্তি হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ)কে খৎনার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তথায় যেতে অস্বীকৃতি জানান। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা রসূল (সাঃ)-এর জীবৎকালেও এ ধরণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতাম।' এ হাদীস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যে কাজের প্রচার শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যক নয় সে কাজের জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জড়ো করা সুন্নতের খেলাফ।

দুই—কোন কোন ক্ষেত্রে বালক বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় একমাত্র খৎনাকারী ডাক্তার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তার গোপ্তাঙ্গ দেখা হারাম। অথচ সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে—গোনার প্রতি কোন লক্ষ্য থাকে না। উপস্থিত সকলের পাপের জন্য আমন্ত্রণকারীকেই দায়ী হতে হবে।

তিন—এ অনুষ্ঠানেও উপহার দানের হিড়িক পড়ে—যার অপকারিতা ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে।

চার—বালকের নানাবাড়ীর পক্ষ থেকে এ সময় কিছু অর্থ-কড়ি দেওয়ার রীতি সাধারণ্যে 'ভাত' বলে পরিচিত। ভারত উপমহাদেশীয় কাফেরগণ কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রাখে—এরই দেখাদেখি এতদ্দেশীয় অজ্ঞ মুসলমানগণও এ রীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর যদি ধরে নেওয়া হয়, এ রীতি হিন্দুদের অনুসরণ নয় বরং মুসলমানগণ একে আবিষ্কার করেছে, তথাপিও তা অশুভই থাকবে। কোন হকদারকে আল্লাহ্-রসূলের নির্ধারিত হক প্রদান না করে তার অনুমতি ব্যতিরেকে সে সম্পত্তি ভোগ করা বিবেক ও শরীয়ত উভয় দৃষ্টিতেই অন্যায়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, কন্যা

সন্তানদেরে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যৎ-সামান্য দানের মাধ্যমে সেই ঋণ পরিশোধের দ্বারা কন্যাদেরে শিশুসুলভ সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। এমনিভাবে যেন কন্যাদের প্রাপ্য আদায় হয়ে যায়। এ কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, এভাবে অনুষ্ঠানে দান করে কারো হক আদায় হয় না। কেননা, কারো হক আদায় করার শরীয়তসম্মত দু'টি পন্থা রয়েছে, এক—মূল সম্পত্তি প্রদান করে, দুই—মূল সম্পত্তির বিনিময় প্রদান করে। এক্ষেত্রে দানকে মুল সম্পত্তি তো বলা যাবেই না, সম্পত্তির বিনিময়ও বলা যায় না। কারণ, ফেকাহর কিতাব অনুযায়ী কোন কিছুকে বিনিয়ম হিসাবে গণ্য করার জন্য যে সকল শর্তাবলী বর্তমান থাকা আবশ্যক সেগুলির অবর্তমানে তো হক আদায় হবে না। এক্ষেত্রে উভয় পন্থাই যখন পরিত্যাক্ত হলো, তখন অপরের হক আদায় হবে কিভাবে?

উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তির যদি কারো কাছে টাকা পাওনা থাকে এবং ঐ দেনাদার যদি পাওনাদারকে কিছু টাকার শিরণী খাওয়ায়, তাহলে শিরণীর বদলে পাওনাদারের টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে—এমন কথা কেউ বলবে না। বরং পাওনাদারের সমুদয় প্রাপ্যই যে অনাদায়ী থেকে গেল তা সকলেই স্বীকার করবেন। এ আলোচনা থেকে আশা করি পাঠক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, 'ভাত' মূল সম্পদও নয় আর না এতে সম্পদের বিনিময় হওয়ার শর্তাবলী রয়েছে, বরং এটা একটা মন বুঝ। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এ রীতি হয়তো বা কাফেরদের অনুসরণে সৃষ্ট অথবা সামাজিক অনাচার থেকে উদ্ভূত—আর উভয় ক্ষেত্রে এ রীতির নিষিদ্ধতা প্রকাশ্য। সুদে অথবা সম্পত্তি বন্ধক রেখে হলেও টাকা জোগাড় করে এ সময় দিতেই হবে। সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ এইভাবে গরীব জোতদারদের সহায় সম্পত্তি দখলের সুযোগ পায়।

মোটকথা, এ সময় উপহার প্রদানকে এতই গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয় যে, সুদে ঋণ গ্রহণেও দ্বিধা হয় না। এ ধরণের একটা অপ্রয়োজনীয় বরং গর্হিত কাজকে ফরয-ওয়াজিব থেকে অধিক আড়ম্বরের সাথে পালন করা কি শরীয়তি বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন নয়? চতুর্থ অপকারিতা হচ্ছে, এ প্রথা পালনেও সুনাম অর্জন ও অহম প্রকাশের একটা দুষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য

করা যায়, যাকে ইতিপূর্বেই হারাম বলা হয়েছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, ছোটদের স্নেহ-প্রীতি দেখানো তো এক প্রকার ইবাদত। জবাবে বলবো, ছোটদের দেখাশুনা ও স্নেহ-প্রীতির সত্যিই যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে এইসব আনুষ্ঠানিক প্রীতি দেখানো ছেড়ে বরং তারা যখন অভাবে পড়ে, তাদের যখন প্রয়োজন হয়, তখন তাদের খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করুন। অভাবের সময় তো কাউকে সহানুভূতি প্রকাশ করতে দেখা যায় না। শুধু শুধু কোন কাজ করলে নাম হবে, লোকে ভালো বলবে, সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে সে ধান্ধায়ই ঘুরতে দেখা যায় সবাইকে।

পাঁচ—কোন কোন এলাকায় খৎনা-অনুষ্ঠানে বা খৎনাকৃত বালক আরোগ্য লাভের পর প্রথম গোসল করার দিন নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। এ সবের অপকারিতার বর্ণনা আগেও এসেছে, পরবর্তীতেও আরো করা হবে ইনশাআল্লাহ। এ সকল কুপ্রথা ও পাপকর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে। বাচ্চা যখন সহ্য করতে সক্ষম হবে তখনই চুপে চুপে ডাক্তার ডেকে খৎনা করিয়ে নেবে। ভাল হয়ে গেলে গোসল করিয়ে দেবে। এ সময় দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব বা গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানো যেতে পারে—তবে অভিভাবকের সামর্থ্য অবশ্যই থাকতে হবে, এবং প্রথার অনুসরণ, প্রশংসিত হবার আকাংখা বা নিন্দনীয় হবার আশংকা ইত্যাদি মন্দ ইচ্ছাসমূহ অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যেই তা করতে হবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বড় কিয়ামতের অর্থাৎ 'বিবাহে'র প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে 'পান-চিনি' প্রথাকে ছোট কিয়ামত বলাই যথোপযুক্ত মনে হচ্ছে। নিম্নের আলোচনা থেকে 'পান-চিনি' প্রথাকে কিয়ামত বলার কারণ সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে ঃ—

এক—চিনি-পানের অনুষ্ঠানে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বরপক্ষ থেকে প্রস্তাবের চিঠি নিয়ে কনের বাড়ীতে আসলে কনেপক্ষীয়গণ ঘরে কোন কিছু না থাকলে ঋণ করে হলেও ঐ ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশক উপঢৌকন প্রদান করে থাকেন। এ অনাবশ্যক রীতিকে এমন অত্যাবশ্যক মনে করা হয় যে, ফরয-ওয়াজিবকে অবহেলা করা যায় কিন্তু একে অবহেলা করা যায় না। ঘরে ডাল-ভাতের জোগাড় না থাকলেও বিয়ের ঘটককে ভাল খাবার দিতে হবে, না হলে পান-চিনিই নষ্ট হয়ে যাবে। এতে করে অপ্রয়োজনীয় কাজকে অত্যাবশ্যকীয় ধারণা করা হয় এবং শরীয়তের সীমারেখা লংঘিত হয়। কাজেই এপ্রথা শরীয়ত বিরোধী। তদুপরি অভাবের সময় এ অনর্থক কাজের জন্য ঋণ করাও শরীয়তের বিরোধিতা ছাড়া কিছু নয়।

দুই—ঘটককে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে দস্তরখানে শ'খানেক টাকা রাখা হয়, বরপক্ষ তা থেকে দু'এক টাকা রেখে বাকী টাকা ফেরৎ দিয়ে দেয় এবং ঐ রেখে দেওয়া টাকা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। দু'এক টাকা লেন-দেনের জন্য একশ' টাকা রাখার কি অর্থ? অনেক সময় এ অনর্থক নিয়ম পালনের জন্য সুদে ঋণ গ্রহণ করা হয়। এ সমস্ত কাজের হোতাদেরে হাদীসে অভিশাপ করা হয়েছে। ঋণ না নিলেও তো এখানে আত্মগর্ব ও প্রতিপত্তি প্রকাশের প্রবণতা ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধি কাজ করে না। একথা যখন সবারই জানা যে, এক দু'টাকার বেশী গ্রহণ করা যাবে না তখন একশ' কেন এক হাজার টাকা দান করলেও তো কোন সুখ্যাতি হবার কথা নয়। দাতার মহানুভবতা তখনই প্রকাশ পায় যখন তার দানকে সম্পূর্ণ দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটা তো একটা তামাশা ও ছেলে-ভুলানো খেলা ছাড়া কিছুই নয়। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এ কাজ সাধারণতঃ করা হয়। আফসোসের বিষয়, তথাকথিত বুদ্ধিমানগণ পর্যন্ত এ অযৌক্তিক প্রথার শিকার হয়ে পড়েছেন।

মোদ্দাকথা, এতে মূলতঃ রিয়া গোনাহ হয় এবং সত্য বলতে কি এ কাজের আদৌ কোন মানে হয় না। রিয়ার পাপ হওয়ার বর্ণনা পূর্বেই এসে গেছে আর অমূলক কাজ নিন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির ইসলামের শোভা হচ্ছে অনর্থক কাজ ও কথা পরিত্যাগ করা।' বুঝা গেল, অনর্থক কাজ রসূল (সাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। সুদে ঋণ গ্রহণ করার দোষণীয়তা সম্পর্কে তো সবাই ওয়াকিফহাল।

তিন—অতঃপর কনেপক্ষ ঘটককে পরনের কাপড় ও শ'খানেক টাকা দিয়ে থাকে। এখানেও আগের মতই এক-দুই টাকা ঘটক গ্রহণ করেন। বাস্তবিকই কি বিচিত্র মানসিকতা—এমন একটা অযৌক্তিক প্রথাকে কোন কোন বুদ্ধিমানও অকপটে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করেন না। এর অপকারিতা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

চার—ঘটক ফেরত চলে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীলোকগণ জড়ো হয় আর গায়িকারা গান শুরু করে। এ ধরণের জড়ো হওয়া ও গান করা শরীয়ত বিরোধী কাজ হওয়ার কারণ আগামী অনুচ্ছেদে বলবো ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ—ঘটক একবার সেই পোশাক পরে নেন অতঃপর সেই উপহৃত টাকা আর কাপড় মহল্লার সকল আত্মীয়-স্বজনের ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা দেখে অনেকে প্রশংসা করেন আর অনেকে পোশাকের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধানে থাকেন। এ প্রথার প্রতিটি পদক্ষেপে নিয়ত বিশুদ্ধ থাকা যদিও আবশ্যক তথাপি বাস্তবে তা হয় না। ঘটকের জন্য জামা জোড়া প্রস্তুত করতে গিয়ে সবারই উদ্দেশ্য থাকে, কেউ যেন দোষ বের করতে না পারে। এতে করে লোক দেখানো ও অপব্যয় হয় যা কোরআন হাদীসে পাপ কাজ বলে ঘোষিত হয়েছে। কেউ কেউ অত্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাতে ত্রুটি খোঁজেন এবং প্রস্তুতকারকদের গীবত করতে শুরু করেন। এই গীবতের জন্য গীবতকারী ও জামা প্রস্তুতকারী উভয়ই গোনাহগার হবে। মোটকথা, জামা প্রস্তুতকারীগণ রিয়া, অপব্যয় ও গীবত ইত্যাদি গোনাহের পাপী হয় আর দর্শকগণ গীবতের কারণে পাপী হয়। কেউ যদি গীবত না করে তবুও রিয়ার গোনাহ হবেই। কেননা, লোকজন যদি প্রশংসা না করতো তাহলে প্রস্তুতকারীর মনে রিয়া স্থান পেত না। এটা এমন এক মন্দ প্রথা যা সবাইকে পাপী করে ছাড়ে।

ছয়—কিছুদিন পর কনেপক্ষ বরের বাড়ীতে মিষ্টি, আংটি, রুমাল চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়। এখানেও রিয়া ও অপব্যয় হয়। উপহার সংগ্রহের অপকারিতা আগেও বর্ণিত হয়েছে, বড় কিয়ামতের অনুচ্ছেদে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে।

সাত—যে লোক মিষ্টি নিয়ে আসে তাকে জামাজোড়া ও তার সাথীদেরে

পাগড়ী ও টাকা-পয়সা দান করে বিদায় দেওয়া হয়। সেই মিষ্টি মহল্লার বয়স্কা মহিলাগণ বাড়ী বাড়ী বিতরণ করেন। যারা মিষ্টি নিয়ে আসে তাদের জন্য সাধারণতঃ কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকে না। পরিশ্রমিক নির্ধারিত না থাকার কারণে কোন লোকই সে কাজ করতে সহজে সম্মত হয় না বরং নিজের ব্যস্ততা, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়তে চায়। তখন কনেপক্ষের কর্তা ব্যক্তি নিজে কিংবা অন্য কোন ভাইয়ের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে তাদেরে যেতে বাধ্য করেন, একাজ সম্পূর্ণ অবিচার ও অন্যায়। অত্যাচারের শাস্তি আখেরাতে হয়ই দুনিয়াতেও হয়। পারিশ্রমিক অনির্ধারিত থাকাও শরীয়ত-বিরোধী কাজ। মিষ্টি বিতরণে রিয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। বিতরণের কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেন তাদের নামায ওয়াক্ত মত তো হওয়া মুশকিল, এমনকি দু'এক ওয়াক্ত ছেড়ে দিতেও তারা কসুর করেন না, এটাও একটা শরীয়ত বিরোধী কাজ। মানহানীর ভয়ে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই দান প্রত্যাখ্যান করা বা ফিরিয়ে দেওয়া শরয়ী আইনের বিরোধিতা। আর এক্ষেত্রে দান গ্রহণ করাও তো রিয়ার প্রথা চালু থাকার সহায়ক। কাজেই এটাও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হবে না। মোটকথা উপরোক্ত সকল দোষণীয় কর্ম অবশ্য পরিত্যাজ্য।

একখানা পত্রের মাধ্যমে বা সাক্ষাৎ আলোচনা করে বিয়ের প্রস্তাব দান করা যায়। একপক্ষের প্রস্তাবের পর অপর পক্ষ যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করে মনঃপুত হলে সে একখানা পত্রের মাধ্যমে বা সাক্ষাতে প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেই চলে। মেনে নিলাম, 'পান-চিনি' করলে তেমন কিছু হয় না। এতে করে গৃহীত প্রস্তাবে অটল দেখানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন ব্যাপারে অটল দেখানোর জন্য পাপ কর্ম করা তো জায়েয নয়। উপরন্তু, এতসব প্রথা পালনের পরও প্রস্তাব মনঃপুত না হওয়ার দরুন তা প্রত্যাখান করতে দেখা যায় প্রায়শই। এতে কোন পক্ষের কিছুই করার থাকে না।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সাধারণ্যের পরিভাষায় যাকে বিয়ে বলা হয় আমি তাকে নাম দিয়েছি বড় কিয়ামত।' এটা এত বড় কিয়ামত যে দ্বীন ও দুনিয়া সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। বিয়ের নামে প্রচলিত প্রথাসমূহের অপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে একে 'বড় কিয়ামত' হিসাবে অভিহিত করা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হবে।

এক—সর্বপ্রথম কনেপক্ষের পুরুষ আত্মীয়গণ একত্র হয়ে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করে চিঠি লিখে তা ঘটকের মারফত বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। এই প্রথা এত কঠোরভাবে পালন করা হয় যে, যত বাধা-বিঘ্নই থাকুক না কেন ঘটককেই সে পত্র নিয়ে যেতে হবে, ডাকে অথবা ঘটকের চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত কাউকে দিয়েও সে পত্র পাঠানো যাবে না। শরীয়ত যা আবশ্যক করেনি তাকে শরীয়তের নির্দেশের চাইতেও বেশী প্রয়োজনীয়ও পালনীয় মনে করা কি আদৌ উচিত হবে? একি শরীয়তের স্পষ্ট বিরোধিতা নয়? আর শরীয়ত বিরোধী রীতি অবশ্য পরিত্যাজ্য নয় কি? পুরুষগণের একত্রিত হওয়াকে জরুরী মনে করাও তেমনি দোষণীয়। কেউ যদি দাবী করেন, পরামর্শের উদ্দেশ্যে পুরুষদেরে একত্রিত করা হয়, তাহলে তা মানা যাবে না। কেননা, আমন্ত্রিতরা এসে কেবল ভিতরবাড়ীতে যে তারিখ ঠিক হয় সেই তারিখই চিঠিতে লিখে দিয়ে যায়। আর একান্ত পরামর্শ গ্রহণই যদি ইচ্ছা হতো, তাহলে তো দু'একজন বুদ্ধিমান দূরদর্শী মুরুব্বীর পরামর্শ নিলেই চলতো, এতো লোককে আমন্ত্রণ করার কোন মানে হয় না। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আবার অনেকে নিজে না এসে ছোট ছোট ছেলেদের পাঠিয়ে দেন—তারা পরামর্শের কোন ঘাট করবে? বোঝা গেল, এ রসূমের প্রত্যেকটা অংশই শরীয়তবিরোধী। শাস্ত্র ও যুক্তি সবটাই এর বিপক্ষে ; অতএব এটা বর্জনীয়। এই রসূমের একটা আবশ্যকীয় অংগ হলো চিঠি বোটাদার এবং লাল রঙের হতে হবে। অনর্থককে আবশ্যক করার তালিকায় এটাও রয়েছে।

দুই—কনের আত্মীয়া ও পড়শী মহিলাগণ মিলে কনেকে একটা পৃথক ঘরে বন্দী করে রাখেন। একে বলা হয় 'জলাসন।' এর নিয়মাবলী হলো, কনেকে একটা খাটে বসিয়ে তার ডান হাতে হলুদের বাটি এবং কোলে

কিছু খেলার বাতাশা রেখে আরো কিছু বাতাশা উপস্থিতদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এরপর প্রতিদিন কনের গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেওয়া আর বন্ধু-বান্ধবও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ চলতে থাকে। এই রসূমেরও অনেক খারাপ দিক রয়েছে। প্রথমতঃ তাকে আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখাকে অবশ্য করণীয় মনে করা—যতই অসহ্য গরম হোক, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসুক অসুস্থ হয়ে পড়ুক এসবে কিছু আসে যায় না—আলাদা ঘরে রাখতেই হবে। অনাবশ্যককে আবশ্যক করে নেওয়ার প্রবণতা এখানেও ক্রিয়া করে। আর যিদ-এর ফলে কনে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে একজন মুসলমানের ক্ষতি করার অপরাধে সংশ্লিষ্ট সবাই পাপী হবে। দ্বিতীয়তঃ বিনা প্রয়োজনে খালি খাটে বসিয়ে রাখার কি মানে? বিছানার উপর বসিয়ে গায়ে হলুদ দিলে বুঝি গায়ে ময়লা লেগে যাবে? এখানেও অনাবশ্যককে আবশ্যক করা হয়েছে—যার নিষিদ্ধতা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ ডান হাতে বাটি রাখা আর কোলে খেলার বাতাশা রাখা ইত্যাদিকে যদি টুটকা মনে করা হয়, তাহলে শিরক হবে। শিরক যে ইসলামের পরিপন্থী তা কে না জানে। টুটকা মনে না করলেও তো এতে এক অনর্থক কাজকে অবশ্যক করে নেয়া হয়। তেমনি ভাবে বাতাশা বিতরণ করাও। এতে করে আত্মম্ভরিতার বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। চতুর্থতঃ যুবতী ও প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের সমবেত হওয়া যে সকল বিশৃংখলার মূল তা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করবো ইনশাআল্লাহ্। শরীর পরিস্কার ও কমনীয় করার উদ্দেশ্যে যদি একান্তই হলুদ মাখতে হয়, তাহলে এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু এসব প্রথা অনুসরণ করা চলবে না।

তিন—এই চিঠি নিয়ে ঘটক যখন বরের বাড়ীতে যান তখন সেখানকার মহিলাগণ সমবেত হয়ে দু'টো বড় বড় পাত্রে সুস্বাদু আহার্যাদি সাজিয়ে রাখেন। এর একটা বহির্বাড়ীতে ঘটকের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা হয় আর অপরটি ভিতরবাড়ীতে ডুমনীদেরে পরিবেশন করা হয়। বরের পুরুষ আত্মীয়গণ ঘটককে বড়ই সম্মানের সাথে তা পরিবেশন করে থাকেন। ডুমনীরা ঘরের দরজার কাছে বসে গালিমিশ্রিত গান গেয়ে থাকে। এ প্রথাও অনাবশ্যককে আবশ্যক করার কারণে শরীয়তবিরোধী। এর দ্বিতীয় মন্দদিকটি হলো, ডুমনীদের গানের

পারিশ্রমিক প্রদান করা হারাম। তৃতীয়তঃ তাদের গান গালিমিশ্রিত হওয়ায় সকল শ্রোতাই এতে পাপী হবে। কেননা, যে গোনাহের সমাবেশে যায় সেও গোনাহগার হয়। উপরন্তু, হাদীসে এ ধরণের গালিমিশ্রিত কথাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। চতুর্থতঃ পুরুষ লোকদেরে জড়ো করাও একটা অযথা কাজ। এক ঘটককে মেহমান নোয়াজী করতে পাড়ার সকল মুরুব্বীর সহায়তার কি প্রয়োজন তা বুঝে আসে না। আসলে এসব কিছুই নয়, আগে থেকে চলে আসছে তাই পালন করতে হয়।

চার—ঘটক শোকরানা খেয়ে নিয়ে কনের অভিভাবকের নির্দেশ মতো এক-দুই টাকা পাত্রে রেখে দেন। এই দু-এক টাকা পরে বরের মধ্যস্থতাকারী ও ডুমনীদের মধ্যে আধাআধি করে ভাগ করে দেওয়া হয়। অপর পাত্রটি ডুমনীরা তাদের ঘরে নিয়ে যায়। অতঃপর মহিলাদের মধ্যে বিতরণের জন্য আরেকটা শোকরানা বরতন প্রস্তুত করা হয়। এই প্রথাতেও রিয়া, অহংকার প্রকাশ এবং অনাবশ্যককে আবশ্যক করার গোনাহ হয়ে থাকে। কাজেই এ প্রথাও সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী।

পাঁচ—সকালে পাড়ার মুরুব্বীগণ মিলে কনেপক্ষের প্রেরিত পত্রের উত্তর লিখেন, ঘটককে দামী জামা জোড়া ও শ'-দু' শ টকা দেন। এ রসুমের আগের মতোই শ' দু' শ টাকা দেখিয়ে দুই-এক টাকা গ্রহণ করা হয়। রিয়া ও অনর্থক কাজ ছাড়াও কখনও কখনও এই প্রথা পালন করার জন্যে সুদে ঋণ গ্রহণ করে আরো বাড়তি পাপ করা হয়।

ছয়—এরপর ঘটক কনেপক্ষের বাড়ীতে পৌঁছে। প্রথম থেকেই সেখানে পাড়ার মহিলাগণ জমায়েত হয়ে থাকে। ঘটক তাঁর জামা জোড়া দেখানোর জন্য অন্দর মহলে প্রেরণ করে, তা নিয়ে পাড়ার সকল ঘরে ঘরে দেখানো হয়। এ প্রথাতে নারীদেরে একত্রিত করা এবং জামা জোড়া প্রদর্শনে রিয়া ও অহম প্রকাশ পায়।

সাত—ঐ দিন থেকে বরকে হলুদ মাখানো শুরু হয়। বিয়ের নির্ধারিত দিন পর্যন্ত পাড়ার মহিলাগণ মিলে বরের বাড়ীতে বরী এবং কনের বাড়ীতে জেহেযের আয়োজন করতে থাকে। এ সময় উভয় পক্ষের বাড়ীতে যে সকল মেহমান আসেন তাদের যাতায়াত খরচ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বহন করতে হয়।

এ ক্ষেত্রেও নারীদের সম্মিলন এবং অনাবশ্যককে আবশ্যক করার গোনাহ হবে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেহমানদের যাতায়াত খরচ দিতেই হবে—এতে সুনাম অর্জন ও প্রতিপত্তি প্রকাশের বাসনা বিদ্যমান। বিয়ে-বাড়ী থেকে খরচ পাওয়া যাবে—মেহমানদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকলে তা জুলুম হবে। রিয়া আর জুলুম দুটোই শরীয়তবিরোধী। বরী ও জেহেয বিয়ের দুটো প্রধান আনুষ্ঠানিকতা। বরী মূলতঃ বর বা বরপক্ষ কর্তৃক কনে বা কনেপক্ষকে প্রদত্ত দান আর জেহেয হচ্ছে অভিভাবক কর্তৃক কন্যার প্রতি স্নেহের নিদর্শন। উভয় কাজই বৈধ বরং উত্তম। কিন্তু প্রচলিত প্রথায় এতে অনেক অপকারিতা নিহীত। সত্যি বলতে কি, সেই বরী ও জেহেযকে বর্তমানে দান ও স্নেহের নিদর্শন মনে করে দেওয়া হয় না, বরং সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে একটা প্রথা হিসাবে তা পালন করা হয়। এই কারণে বরী ও জেহেযের প্রচার করা হয়। বরীতে কি কি জিনিস থাকবে তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। এতে এক বিশেষ ধরণের পাত্র ব্যবহার করা জরুরী মনে করা হয়। বড়ই আড়ম্বরের সাথে তা কনের বাড়ী প্রেরণ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে উপস্থিত সকলের সামনে বরী উন্মুক্ত করা হয়। বরী প্রদানে যদি দান করার উদ্দেশ্যে হতো, তাহলে ঘটা করে প্রথা পালন না করে বরং যখন যা পাওয়া যেত তা-ই চুপে চুপে কনের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। জেহেযের উপকরণাদিও তেমনি নির্দিষ্ট রয়েছে। কোন্ দিন দিতে হবে? কি দিতে হবে? কখন দিতে হবে? কে দেখতে পারবে? কে পারবে না-ইত্যাদি সব কিছুই নির্ধারিত। স্নেহ-মমতা দেখানোর সত্যিই কোন ইচ্ছা থাকলে এসব নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে যখন যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তা-ই প্রদান করা যায়। দান-উপহার করার জন্য কেউ কোন দিন ঋণ করতে রাজী হবে না, কিন্তু এ প্রথা পালনের জন্য সুদে হলেও ঋণ করবে। নিজের জায়গা-জমি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে হলেও এ অর্থ সংগ্রহ করতেই হবে। অতএব এ ক্ষেত্রেও অনাবশ্যককে আবশ্যক করা, প্রশংসিত হবার বাসনা এবং অপচয় ইত্যাদি পাপ রয়েছে। কাজেই নিষিদ্ধ কাজের তালিকায় এর নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আট—বরযাত্রার আগের দিন বরপক্ষের প্রতিনিধি কনের জন্য মেহদী

নিয়ে এবং কনেপক্ষের প্রতিনিধি বরের জন্য জামা-জোড়া নিয়ে একে অপরের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঐ দিন বরের বাড়ীতে মহিলাগণ জমায়েত হয়ে কনের চুলা তৈরী করেন। গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বাতাশা বিতরণ করেন। এটা একটা অযথা কর্ম যাকে আবশ্যক করে নেয়া হয়েছে। মহিলাদের জমায়েতে অগণিত দোষণীয় দিক বিদ্যমান। যেমন—

(১) কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই নতুন পোশাক বানানোর ধান্ধায় লেগে যায়। কখনও বা স্বামীর উপর নতুন পোশাক দানের নির্দেশ জারী হয়, কখনও বা নিজেই দর্জি ডেকে এনে ধানে বা সুদে কাপড় ক্রয় করে নেয়। স্বামী অসামর্থ্যতার অজুহাত পেশ করলেও কোন ফলোদয় হয় না। আসলে রিয়া ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এ নতুন পোশাকের আবদার।

(২) এই উদ্দেশ্যে সম্পদের অপচয় হয়।

(৩) আর্থিক সঙ্গতির বাইরে অপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয়ের জন্য স্বামীকে চাপ দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়।

(৪) গায়র মুহাররম কাপড় বিক্রেতাকে ডেকে এনে তার সাথে কথা বলা, তার সামনে বিনা প্রয়োজনে চুড়ী-মেহদি ইত্যাদি প্রকাশ করা ইসলামী পর্দার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

(৫) সুদে কাপড় কেনা সুদ প্রদানেরই অন্যরূপ।

(৬) স্ত্রীর অত্যধিক পীড়াপিড়িতে স্বামী যদি হারাম আয় অর্থাৎ, অন্যের হক আত্মসাৎ, ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি করে স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাহলে হারাম কাজে উদ্বুদ্ধ করার অপরাধে স্ত্রীগোনাহগার হবে।

(৭) এসব পোশাকে ব্যবহারের জন্য অনেক সময় সোনা-রোপার বোতামাদি খরিদ করা হয়। এতে অজ্ঞানতা বশতঃ সুদে ঋণ গ্রহণ করে হারাম কাজ করা হয়।

(৮) যে কোন পোশাক নিয়ে এক অনুষ্ঠানের পরে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া অপমানজনক ভেবে বার বার নতুন নতুন পোশাক তৈরী করে ঐ গোনাহসমূহ পুনঃ পুনঃ করা হয়।

(৯) অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অন্যের অলংকার চেয়ে নিয়ে পরা এবং ধার করে আনার কথা গোপন রেখে তা নিজের বলে প্রকাশ করা এক ধরণের মিথ্যাবাদিতা। হাদীসে আছে,—'যে অপরের জিনিষ ব্যবহার করে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করে সে যেন মিথ্যা ও ধোকার দুই কাপড়ে আপদমস্তক ঢেকে নিল।'

(১০) অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে মহিলাগণ এমন অলংকার পরে থাকেন যেগুলোর ঝংকার অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে। শব্দকারী অলংকার পরা এমনিতেই নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে—'প্রতিটি বাজনার সাথে শয়তান রয়েছে।'

(১১) রওয়ানা হবার সময় গোসল আর সাজ-পোশাক করতে করতে কোন দিকে নামাযের সময় গত হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল থাকে না— এভাবে নামায কাযা হয়ে গেলে আরেকটা বিরাট গোনাহ হয়।

(১২) গাড়োয়ান তাড়াহুড়া করলে বেগম সাহেবা তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন, তা রাস্তার লোকও শুনতে পায়। বিনা কারণে কোন গরীব লোককে এভাবে গালিগালাজ করা প্রকাশ্য যুলুম।

(১৩) বেগম সাহেবা যখন পাল্কীতে বা গাড়ীতে চড়ে বিয়ে বাড়ী রওয়ানা হন তখন পথচারীদেরে সুগন্ধীতে আপ্লুত করে চলেন। পর্দা রক্ষার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। গায়র মুহাররম পুরুষের সামনে দিয়ে বেহায়া নারীর এ ধরণের চলাফেরাকে হাদীস শরীফে কঠোর ভাবে তিরস্কৃত করা হয়েছে।

(১৪) যানবাহন থেকে নেমেই বে-পরওয়াভাবে ঘরে ঢুকে পড়লে অনেক সময় ভিতরে অবস্থানকারী গায়র মুহাররম পুরুষের সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরণের সন্দেহ থাকলে প্রথমেই অনুসন্ধান করে দেখে-শুনে ঘরে প্রবেশ করা উচিত। অন্যথায় গোনাহ হবে।

(১৫) ঘরে প্রবেশ করে সালাম না করা বা মুখে উচ্চারণ না করে কেবল মাথায় হাত লাগিয়ে সালাম করা বা শুধু 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা সুন্নতের খেলাফ।

(১৬) কয়েকজন স্ত্রীলোক একত্র হলে গীবত করাটা তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়—অথচ গীবত করা সম্পূর্ণ হারাম।

(১৭) আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নিজের পোশাক-আশাক ও অলংকারাদির প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে হাত-পা তথা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানো রিয়া—হারাম।

(১৮) অন্যের সাজ-পোশাকের প্রতি কটাক্ষ করে তাকে ছোট লোক ও নিজেকে বড়লোক ভাবা সুস্পষ্ট অহংকার।

(১৯) অন্যকে নিজের চেয়ে উত্তম পোশাকে সজ্জিত দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া, নিন্দাবাদ করা ও লোভ করা সবকিছুই গোনাহ্‌র কাজ।

(২০) অযথা গল্প-গুজব করে নামাযের সময় অতিবাহিত করা বা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়াও গোনাহ্‌র কাজ।

(২১) অনুষ্ঠানাদিতে জড়ো হয়ে একে অপরের কাছ থেকে দেখে দেখে, শুনে শুনে এ সমস্ত অবাঞ্ছিত প্রথাসমূহ শিক্ষা করা যেমন পাপ, শিক্ষা দেওয়াও তেমনি পাপ।

(২২) পানি আনয়নকারী পুরুষদেরে নেকাব লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয় অথচ স্ত্রীলোকগণ আলাদা ঘরে থাকতে রাজী নন। ইচ্ছা করে বেগানা পুরুষের চোখের সামনে বসা হারাম জেনেও একাজে তাদের লজ্জা হয় না।

(২৩) এক একজন ভদ্র মহিলা তিনটা-চারটা ছেলে-মেয়ে সাথে নিয়ে খেতে বসেন। বাচ্চারা খাদ্যদ্রব্যের অপচয় করে। মেজবানের মাল ও মানের যতই ক্ষতি হোক না কেন সেদিকে লক্ষ্য করা হয় না।

(২৪) খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ বাড়ীতে ফেরত যাবার সময় যানবাহনের দরজায় সবাই একসাথে ইয়াজুজ-মাজুজের মত ভিড় করে। গাড়ীর ছোট্ট দরজা দিয়ে কে কার আগে উঠবে এই প্রতিযোগিতা চলে। গাড়োয়ান দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করে।

(২৫) কারো কোন কিছু হারিয়ে গেলে প্রমাণ ছাড়াই কাউকে অপবাদ দেওয়া এমনকি অনেক সময় তার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় গোনাহর কাজ প্রায় প্রত্যেক বিয়ে-শাদীতেই হয়ে থাকে।

(২৬) বিয়ে-বাড়ীর পুরুষ সদস্যগণ প্রায়ই কারণে-অকারণে ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করেন, তাদের সামনে পড়লে কোন কোন মহিলা মুখ ফিরিয়ে নেন,

কেউ কেউ অন্য লোকের আড়ালে চলে যান, কেউ কেউ মাথা নীচু করেন—মনে করেন এতে পর্দা হয়ে গেছে আর বিশেষ পরিচিতাগণ তো পর্দা করার প্রয়োজনই বোধ করে না।

(২৭) বর ও বরযাত্রীদের আনাগোনা এবং ঢং-তামাশা দেখা স্ত্রীলোকদের নিকট জরুরী মনে হয়। বেগানা পুরুষকে নিজের শরীর দেখানো যেমন জায়েয নয়, বেগানা পুরুষকে দেখাও তেমনি নাজায়েয।

(২৮) বিয়ের পর কয়েক দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী মহিলাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বর্ণনা অনবরত চলতে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে মহিলাগণ জড়ো হয়ে এমনি ধরণের আরো অনেক গোনাহে শরীক হন—যা সচেতন দ্বীনদার মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম। অতএব, আমার মতে, সর্বাগ্রে এইসব অনাসৃষ্টির মূল কারণ অর্থাৎ, বিয়েতে অযথা স্ত্রীলোকের সমাবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

নয়—বিয়ের দিন সকালে বরকে গোসল করিয়ে বাদশাহী সাজে সজ্জিত করা হয়। কোন কোন বিয়েতে বরকে শরীয়তবিরোধী পোশাক পরাতে দেখা যায়। পোশাক পরানোর পর বরকে ঘরে ডেকে নিয়ে একটা খাটের উপর দাঁড় করিয়ে বোন-ভাগ্নির হক আদায় করা হয়। এ সময় পাড়ার মহিলাগণ জড়ো হয়ে ভিখারীদের মধ্যে টাকা-পয়সা বিতরণ করেন। অনেক পর্দাশীলা মহিলা এ সময় বরের সম্মুখে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তারা মনে করেন, এটা বরের জন্য লজ্জার সময়, তাই কারো দিকে তাকাবে না। অনেক ধরণের লোক আছে, তন্মধ্যে কেউই যে স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাবে না, এ নিশ্চয়তা কোথায় পেলেন? বর্তমানে তো খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশী বর না দেখলেও বরকে দেখা উচিত হবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, যে দেখে এবং যে নিজেকে প্রদর্শন করে এ উভয় ব্যক্তিই আল্লাহর অভিশপ্ত। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বর ও স্ত্রীলোকগণ সমান পাপী হবে।

দশ—বর্তমানে বরযাত্রাকে বিয়ের একটা বিরাট অপরিহার্য অংগ বলে ধারণা করা হয়। এ নিয়ে বর ও কনেপক্ষের মাঝে অনেক কথা কাটাকাটি হতে দেখা যায়। আসলে সুনাম ও অহংকার প্রকাশার্থেই এ আড়ম্বর। প্রথম প্রথম বোধ হয় ডাকাতের হাত থেকে জানমালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশে

প্রতি ঘর থেকে একজন করে বরযাত্রী নেওয়ার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে পথে বিপদাশংকা থাক বা নাই থাক বরযাত্রীর সংখ্যা অধিক হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি অনেক সময় কনেপক্ষ পঞ্চাশ জনের কথা বললে তারা যান একশ' জন। এভাবে আমন্ত্রণ ব্যতীত কারো বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে গেল সে যেন চোর হয়ে প্রবেশ করে লুটেরা হয়ে বেরিয়ে এল।' অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি চোর ও লুটেরার মতো পাপী হবে। নির্ধারিত সংখ্যকের বেশী বরযাত্রী কনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলে কনেপক্ষকে লজ্জায় পড়তে হয়। এভাবে কাউকে অপমান করা গোনাহর কাজ। মাঝে মাঝে এই বরযাত্রীর সংখ্যা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে এমন অনভিপ্রেত রেষারেষির সৃষ্টি হয় যে, আজীবন তার প্রভাব মন থেকে দূর হয় না। জেদবশতঃ কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হারাম বিধায় এর কারণ অর্থাৎ, অত্যধিক সংখ্যক বরযাত্রী গমন করাও নাজায়েয।

এগার—বর এলাকার কোন প্রসিদ্ধ মাজার যিয়ারত করে নিয়ে বরযাত্রীদের সাথে পথে মিলিত হয়ে থাকেন। এ প্রথার ব্যাপারে জাহেলদের বিশ্বাস তো শিরক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী কোন লোক যদি এ প্রথা পালন করে তাহলে ভ্রান্তপন্থীদের কাজে সহায়তা ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার অপরাধে পাপী হবে।

বার—কিছু মেহদী কনেকে লাগিয়ে দিয়ে বাকীটুকু অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এ প্রথাও অনাবশ্যককে আবশ্যক করা এবং একে অমান্য করাকে দোষণীয় মনে করা শরীয়তী বিধানের সীমালংঘন।

তের—ঘরের লোকজন যে যে কাজ করুক তাকেই সে কাজের এনাম দিতে হবে। কেউ চুলা তৈরী করে এসে এনাম চাইলে তাকে একটা পাত্রে গুড়-নারিকেল ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। এমনিভাবে প্রতিটি ছোট বড় কাজের জন্য জরিমানা দিতে হয়। কাজের মানুষকে দেওয়া তো খারাপ কিছু নয়। তবে এভাবে দেওয়ার কি প্রয়োজন। আসলে সুনামের আকাংখাই এ প্রথা পালনে অনুপ্রাণিত করে থাকে। এ ধরণের এনামকে পারিশ্রমিক বলে গণ্য করাও অবান্তর। কেননা, নির্দিষ্ট কাজে পারিশ্রমিক না বলে বরং

এনাম বলা যায়। আর এনাম বা দান জোর করে আদায় করা হারাম। যে জিনিস গ্রহণ করা হারাম তা প্রদান করাও হারাম। একে পারিশ্রমিক মনে করলে অনির্দিষ্টতার কারণে হারাম হবে।

চৌদ্দ—বরযাত্রীগণ কনের বাড়ীতে পৌছলে উভয় পেক্ষর সামনে বরী খোলা হয়—বরী প্রদানের মূলে যে অহংকার ক্রিয়া করে তা-ই এখানে এসে আত্মপ্রকাশ করে।

পনর—বরীর জিনিষপত্র কনেপক্ষের কাজের লোকজন এক একজন এক একটা করে মাথায় তুলে ভিতরবাড়ীতে নিয়ে যায়। এইভাবে রিয়াকে আরো প্রকাশ্যভাবে পালন করা হয়। বরীর সমস্ত জিনিষপত্র একজন একই সাথে বহন করতে পারলেও অনেক লোককে একাজে লাগিয়ে এটাই বুঝানো হয় যে, বরপক্ষ অঢেল বরী নিয়ে এসেছেন—এতে বর কনে উভয় পক্ষের সুনাম উদ্দেশ্য থাকে।

ষোল—বরীর পেছনে পেছনে বিয়ে বাড়ীর অনেক পুরুষ সদস্যও নারী মহলে প্রবেশ করেন। এ দিনে সকলপ্রকার পাপ ও লজ্জাহীনতার কাজ করাকে হালাল এমনকি ভদ্রতা মনে করার কারণ খুঁজে পাই না।

সতর—বরীর জিনিষপত্রের মধ্য থেকে উপস্থিত সময় ব্যবহার্য কিছু জিনিষ রেখে দিয়ে বাকীগুলো বরপক্ষের নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। যে বস্তু ফেরত আসবেই এমন বস্তু দেওয়ার কি মানে? আসলে লোক দেখানো ও আত্মপ্রশংসার জন্যই এ দান—তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অনেক বিয়েতে এমনও হয় যে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কনেপক্ষের অনুরোধ বা বিনা অনুরোধে বরপক্ষ অন্যের অলংকারাদি ধার করে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত করে পরে তা আবার আসল মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ জাতীয় কার্যকলাপ শরীয়ত ও বিবেক সব কিছুরই পরিপন্থী অথচ লোকজন এতেই আনন্দ অনুভব করে।

আঠার—অনেক সময় বিয়ের এ সকল প্রথা-রীতি আঞ্জাম দিতে গিয়ে রাতভর সজাগ কাটাতে হয়। রাতের শেষভাগে নিদ্রায় ঢলে পড়ে অনেকেরই নামায কাযা হয়। বদহজমের কারণে অনেকের অবস্থা নাজেহাল হতে দেখা যায়। এ দুর্গতি থেকে আল্লাহ্ সবাইকে রহম করুন।

উনিশ—কনে বাড়ীর ফটকে ফিতা বেঁধে বরের নিকট থেকে অর্থ আদায় করা এবং বরকে শরবত পরিবেশন করে অর্থ আদায় করা ইত্যাদিকে যদিও অনেকে দান হিসাবে চালিয়ে দিতে চান, কিন্তু আসলে অনিচ্ছা সত্ত্বে এসব অর্থ প্রদান করাকে যাকাতের চেয়েও বড় ফরয কর্তব্য মনে করা হয়। বড়ই তাজ্জব ব্যপার! কাউকে দান করতে বাধ্য করা কি হারাম নয়? শুধু কি লাঠি-ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করাই যুলুম? নিন্দাবাদের ভয় দেখিয়ে কোন কিছু আদায় করাও তো যুলুম। উপরন্তু এসব ব্যাপারে অর্থের দাবীদারগণ যেন অনেক দিন পর অর্থ আত্মসাৎকারী খাতককে হাতে নাতে ধরতে পেরে তার সর্বস্ব বিক্রি করে হলেও নিজেদের পাওনাটা আদায় করে নিতে চায়। বর বেচারাও বড়ই অপারগ হয়ে লজ্জা-শরমে পড়ে তা দিয়ে দেয়। এ ছাড়াও, বিজাতীয়দের রীতি প্রথা অনুসরণ করা মুসলমানদের পক্ষে মোটেও বৈধ হবে না। অতএব, এ প্রথাগুলি সর্বৈব পরিহার্য্য।

বিশ—বিয়ের অনুষ্ঠানাদিতে যে সকল রীতি-নীতি সচরাচর পালিত হয়ে আসছে তন্মধ্যে একমাত্র শরীয়তসম্মত রীতি হচ্ছে, কাজী সাহেবকে আনিয়ে বিয়ে পড়ানো। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শরীয়তী বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ কাজী সাহেবানদের অভাব নেই। তারা মাঝে মাঝে এমন সব বিয়ে শাদীও পড়িয়ে থাকেন যার অবৈধতা সম্পর্কে খুব কম লোকই অনবহিত। এতে করে বর-কনে সারাজীবন অবৈধ সম্পর্ক রক্ষার পাপ তথা ব্যভিচার করে। অনেক লোভী পেশাদারী মৌলভী অর্থের লোভে পড়ে বিয়ে জায়েয কি নাজায়েয সেদিকে লক্ষ্য না করেই ফরমায়েশী আক্‌দ পড়িয়ে দেন। বিয়ের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্বন্ধে নিজেদের পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে ভালো আলেম ব্যক্তিকে দিয়ে বিয়ে পড়ানো উচিত।

একুশ—যিনি বিয়ে পড়ান তাঁকে হাদিয়াস্বরূপ কিছু দান করা হয়। অনেকে এ দানকে অবশ্য আদায়যোগ্য হক্ব মনে করেন, এমন কি যদি কেউ না দেয় অথবা প্রচলিত নির্ধারিত পরিমাণের কম দেয় তাহলে এনিয়ে তাকে গালমন্দ করা হয় এবং দিতে বাধ্য করা হয়। মাঝে মাঝে ভদ্রতা দেখিয়ে মুখে কিছু বলেন না, তবে মনে মনে অসন্তুষ্টির ভাব দেখান। 'রেফাহে মুসলিমীন শরহে মাসায়েলে আরবাঈন' কিতাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে এ

ধরণের আচরণকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অনেক অঞ্চলে দেখা যায়, বড় সাহেব বিয়ে পড়ানোর জন্য তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি হাদিয়াস্বরূপ যা পান, তার বেশার্ধ সাহেব এবং বাকীটুকু প্রতিনিধি ভাগ করে নেন। সাহেবের এ দাবী অযৌক্তিক, প্রতিনিধির প্রাপ্ত হাদিয়ায় অংশ দাবী করা জায়েয হবে না। মনে রাখা উচিত, সন্তুষ্ট চিত্তে দান করলে তার গ্রহণ করা জায়েয। আর দান যাকে করা হয় সেই তার অধিকারী ; অন্য কেউ নয়। যেমন, প্রতিনিধিকে যে দান করা হয় তা সম্পূর্ণটাই প্রতিনিধির। সাহেব প্রতিনিধিকে নিয়োগ দিয়েছেন বলে এতে ভাগ বসানো ঘুষ গ্রহণ করার নামান্তর। ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই পাপী—হারামকারী।

বাইশ—কনেপক্ষের খাদেম বরের হাত ধুইয়ে দিলে তাকে ধোলাই বাবদ কিছু টাকা দেওয়া হয়। এ এনাম আসলে তো ভদ্রতা ও এহসান। কিন্তু দাতা যদি একে ওয়াজিব কর্তব্য এবং না দেওয়া দোষণীয় মনে করে তাহলে এ দান লওয়া দেওয়া দুটোই নাজায়েয হবে। কেননা আগেই বলেছি, কাউকে দান করতে বাধ্য করা হারাম। একে কাজের পারিশ্রমিকও বলা যায় না। কেননা, লোকটি তো কনেপক্ষের, কাজেই কনেপক্ষের নিকটই সে পারিশ্রমিক দাবী করবে। বরপক্ষের নিকট চাওয়ার? কি অর্থ তারা তো মেহমান। তাদের কাছ থেকে চাকর টাকা গ্রহণ করবে, এটাকি ভদ্রতা?

তেইশ—বরের জন্য শোকরানা প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হয় এবং প্রত্যেক বরযাত্রীর পাত্রে তা থেকে কিছু দেওয়া হয়। এখানেও একটা অনর্থক রীতিকে আবশ্যক করে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, শোকরানা প্রস্তুত না করলে অমঙ্গলের আশংকা করা হয়। প্রায় প্রতিটি কুপ্রথা পালনে এ এ জাতীয় মনোভাব জন্ম নিয়ে থাকে। এ মনোভাব এক ধরণের শিরক। হাদীসে এসেছে,—'কুলক্ষণ ও অমঙ্গলের কোন ভিত্তি নেই।' শরীয়ত যার ভিত্তিকে অস্বীকার করেছে মানুষ তার উপর নির্ভর করে পুল বানিয়ে নিয়েছে। একি শরীয়তের স্পষ্ট বিরোধিতা নয়?

চব্বিশ—খাওয়া-দাওয়া শেষে মেহমানগণ বাড়ীতে রওয়ানা হয়ে গেলে পর বরকে যখন শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন রাত্রি প্রায় শেষ। বর হিসাবে হলেও একজন আমন্ত্রিত মেহমান হিসাবে অতন্তঃ তাকে এত

দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসিয়ে রাখা নিশ্চয়ই ভদ্রতা নয়। মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ শরীয়ত ও বিবেকের নির্দেশ। বরযাত্রীগণ কি মেহমানের পর্যায়ভুক্ত নন?

পঁচিশ—সকালে কনের বাড়ীতে বরযাত্রীদের নিয়ে আসা দফ বাজানো হয়। সাধারণ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে বিয়েতে দফ বাজানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। কিন্তু বর্তমানে একথা নিশ্চিত যে, কেবল শান-শওকত ও অহমিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই দফ বাজানো হয়। ইসলামী বিধানের রীতি হচ্ছে, যখন কোন মুবাহ কার্য অন্য কোন পাপের সহায়ক হয়, তখন সে মুবাহটিও পাপ হয়ে যায়। কাজেই বিয়েতে দফ বাজানোও একটি বর্জনীয় মুবাহ কর্ম। প্রচারের অনেক পন্থা রয়েছে, আর আজকাল তো বিয়ের সকল অনুষ্ঠানাদিতেই অনেক লোকের সমাগম হয়। বিয়ের আগে পরে অনেক দিন পর্যন্ত এলাকার সকলের মুখে এর পর্যালোচনা চলে। দফের সাথে সানাই বাজানো কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। হাদীসে একে তিরস্কার করা হয়েছে।

ছাব্বিশ—বরকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মহিলাগণ জড়ো হয়ে নির্লজ্জ আলাপচারিতায় লিপ্ত হন। তাদের কথাবার্তায় চরম বেহায়াপনা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরণের কাজ যে নিতান্ত গোনাহ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সাতাশ—ভদ্রতাসুলভ আচরণ বড়জোর এতটুকু করা হয় যে, বরের রুমাল চেয়ে নিয়ে সালামতীর টাকা সংগ্রহ করে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে কয়েক ক্ষেত্রে উপহার ও সালামতীর টাকা প্রদান করার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম যুগে মনে হয়, কোন দরিদ্র লোকের বিয়ে শাদীতে তার আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক এ ধরণের উপহারাদি প্রদান করার রীতি ছিল। এতে করে অসচ্ছল ব্যক্তির পক্ষে বিয়ের ব্যয়ভার বহন করা তেমন কষ্টকর হতো না এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারো একজনের উপর বেশী করে দান করার চাপ পড়ত না। দানস্বরূপ প্রদান করলে তার বিনিময় চাওয়া হতো না, তবে দাতার প্রয়োজনের সময় দরিদ্র ব্যক্তির সামর্থ্য থাকলে এহসানের বদলে এহসান করার মানসিকতা নিয়ে তাকে সাহায্য করা হতো। এতে দাতার দানের পরিমাণ কত ছিল সেদিকে লক্ষ্য করা হতো না। আর ঋণ হিসাবে প্রদান করলে তা কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া সহজ হতো।

সত্যি বলতে কি, সে সময়কার সেই রীতি গরীব জনসাধারণের জন্যে অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ রীতির কোন উপকারিতা তো পরিলক্ষিত হয়ই না বরং অপকারিতাই বেশী। যে উপহার সংগৃহীত হয় তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই বর বা কনেপক্ষের হাতে পৌছায় না। যেখানে সেখানে ব্যয়িত হয়ে যায়। ঋণের টাকা হাতে না পেয়েই বরকে ঋণগ্রস্থ হতে হয়। এই কি সভ্যতার বিচার? এ নিয়ে আবার ঝগড়া-ফ্যাসাদ কত কিছু হয়। বিনা প্রয়োজনে ঋণগ্রস্থই বা হতে যাবে কেন কেউ? বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে নাজেহাল হবার কার এত শখ? সে ঋণ আবার সচ্ছলতা এলেই পরিশোধ করা যাবে না, কেবল অন্য অনুষ্ঠানে দান করেই তা পরিশোধ করতে হবে। তখন হাতে না থাকলে অনেক সময় সুদে ঋণ নিয়ে হলেও তা আদায় করতে হয়। যে রেওয়াজ পালন করতে গিয়ে গোনাহর পাহাড় কাঁধে নিতে হয় সে রেওয়াজ কি অবশ্য বর্জনীয় নয়?

আটাশ—বিয়ের অনুষ্ঠানে গীতানুষ্ঠান করা জায়েয মনে করে অনেকেই গায়িকাদের নিমন্ত্রণ করে এনে গানের আসর করেন। অথচ কোন ধরণের গীত যে জায়েয ছিল আর বর্তমানে যে কোন ধরণের গান চলে তা চিন্তা করা হয় না। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, এক ব্যক্তি অন্যের রুটি লুট করে এনে মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, রুটি হালাল না হারাম? মুফতী সাহেবের কাছ থেকে বৈধতার ফতওয়া পেয়ে লোকটি আরো বেশী করে রুটি লুট করতে শুরু করে দেয়। এই ধরণের ফতওয়ায় কোন কাজ হবে না। লুট করে সংগ্রহ করা রুটি হালাল কি না,—প্রশ্ন করে দেখুন মুফতী সাহেব কি জবাব দেন। এ উদাহরণ থেকে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, গায়িকাদেরে আনিয়ে বর্তমানে যে ধরণের গীত গাওয়ানোর রীতি প্রচলিত, তাতে কত যে দোষণীয় ও ক্ষতিকারক দিক রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য দেয়া উচিত।

ইমাম আবু হানিফার মাযহাব অনুযায়ী গান যে হারাম একথা কোন আলেমই অস্বীকার করতে পারবেন না। কারো মনে মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে ; ঈদের দিনে হুযূরের (সাঃ) সামনে দুই বালিকার গান গাওয়া কি

এর বৈধতা প্রমাণ করে না? এর উত্তরে বলা যায়, সেই গায়িকাদ্বয় অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন এবং তারা উচ্চস্বরে গান করেন নি। হাদীসে ব্যবহৃত 'জারিয়াতাইনে 'মুগ নিয়াতাইনে' শব্দ দুটি এই অর্থই প্রমাণ করে। বর্তমানে প্রচলিত গানে গায়র মুহাররম নারীর কণ্ঠ পুরুষের কানে পৌঁছে তার রিপুতে শক্তি যোগায়—যা সুস্পষ্ট হারাম। এ ছাড়াও সারারাত ধরে ঢোলক আর বাদ্যযন্ত্রের শব্দে আশপাশের বিশেষতঃ উপস্থিত লোকজনের ঘুম হয় না, রাতের শেষভাগে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে সকাল পর্যন্ত মড়ার মত পড়ে থাকে, এভাবে ফজরের নামায কাযা হয়। গান শুনে রাত জাগা আর নামায কাযা করা দুটোই তো হারাম। এখন চিন্তা করুন, নিজে গান করা, অন্যকে দিয়ে গান করানো এবং গানের পারিশ্রমিক প্রদান করা কতটুকু জায়েয হতে পারে। তাও আবার শুধু বিয়ের বাড়ীর লোকজন নয় বরং অনুষ্ঠানে সমবেত সকলেই তা প্রদান করতে হবে, না দিলে গালমন্দ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। ঐচ্ছিক দানের ক্ষেত্রে এ ধরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করাও গানের আসর হারাম হওয়ার আরেকটি কারণ।

ঊনত্রিশ—খাওয়া দাওয়ার শেষে জেহেযের যাবতীয় সামগ্রী সকলের সামনে এনে দেখানো হয়, অলংকারাদির তালিকা পাঠ করে শুনানো হয়—এসব কি রিয়া নয়? তাছাড়া নারীর কাপড় চোপড় পুরুষদের দেখানো কি নির্লজ্জ কাজ নয়?

ত্রিশ—কন্যা বিদায়ের কালে পাল্‌কী বা গাড়ী যখন বাড়ীর দরজার কাছে আসে তখন পিতা ও ভাইকে ডেকে নিয়ে কনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বলা হয়। এই সময় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক জায়গায় সমবেত হওয়া ন্যাক্কারজনক কাজ।

একত্রিশ—মেয়েকে পালকীতে তুলে দিয়ে সবাই অবিবেচকসুলভ কান্না জুড়ে দেন। বিদায়বেলা কিছু লোকের মনে আঘাত লাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু তাই বলে সবাই মিলে হাউমাউ শুরু করে দেওয়া তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনেকে তো রুসূম পালনের উদ্দেশ্যে কেঁদে থাকে। মনে করে, না কাঁদলে লোকে ভাববে মেয়েটি তাদের বোঝা ছিল, তাকে বিদায় করে দিয়ে তারা দায়সারা হতে চাচ্ছে। আর এ অযথা কান্না ধোকা দেওয়ার

শামিল—যা শরীয়ত ও বিবেকের মতে পাপ।

বত্রিশ—শ্বশুর বাড়ীতে বধু উঠানোর সময় বরকে দরজার কাছে এনে দাঁড় করানো বাধ্যতামূলক কাজ। এটা এক ধরণের কুসংস্কার যা বিকৃত আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। এই সময় অনেক পর্দাশীলা মহিলাও বেপর্দা হয়ে তামাশা দেখতে উপস্থিত হন।

তেত্রিশ—বধুকে ঘরে তুলে ক্বিবলামুখী অবস্থায় খাটে বসিয়ে রেখে সাতজন অভ্যর্থনাকারিনী একত্রিত হয়ে তার ডান হাতে সামান্য মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দিয়ে থাকে। অতঃপর তাদেরই একজন তা খেয়ে ফেলে। এই ধরণের কুসংস্কার আসলে বিকৃত আক্বীদা-বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। সাধারণ মানুষ এ কুপ্রথাকেই শুভাশুভের নিয়ামক মনে করে—যা সম্পূর্ণ শেরকী মন-মানসিকতা প্রসূত। কিবলা রুখ হওয়া কাজটা তো মন্দ কিছু নয় বরং ভালো, কিন্তু একে যদি ফরযের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে তাতে শরীয়তের নির্ধারিত সীমা লংঘনের পাপ হবে।

চৌত্রিশ—অতঃপর মণ দু'মণ মিষ্টি বিতরণ করার পর নববধুর মুখ দেখানো শুরু হয়। সর্বপ্রথম শ্বাশুড়ী বা পরিবারের সর্বাধিক বয়স্কা মহিলা নববধুর মুখ দেখে কিছু দর্শনী দিয়ে থাকেন। বধুর পাশে উপবিষ্টা মহিলাগণ দর্শনী জমা করে রাখেন। এই মুখদর্শন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাকে তখন মুখ দেখানো হয় না অতঃপর আর কোনদিন তিনি সেই বধুর মুখ দেখতে পারবেন না। এটাও তো শরীয়তী বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। শাড়ী বা হাত দিয়ে নববধুর চেহারা ঢেকে রাখাকে এতবড় ফরয কর্তব্য মনে করার কারণ খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধি পেরেশান হয়ে যায়। এটা কি ইসলামী পর্দা? নাকি তার বিকৃতি? লজ্জা-শরমের পাহাড় ভেঙ্গে নববধুরা নামায পর্যন্ত পড়তে সাহসী হয় না। নামায আদায় করা তখন তাদের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপারে পরিণত হয়। সঙ্গিনীগণ যদি না বলতেই নামাযের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে হয়তো নামায পড়া হতে পারে, নতুবা স্ত্রীজাতির ধর্মে এ অনুমতি নেই যে, নববধু নিজেই উঠে গিয়ে বা কাউকে বলে কয়ে নামায পড়ে ফেলবে। নতুন বৌ-এর পক্ষে নড়াচড়া করা, কথা বলা, পানাহার, শরীর চুলকানো, হাঁচি দেওয়া, হাই তোলা, ঘুমের ঘোরে শুয়ে পড়া, পেশাব-পায়খানায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ

করা ইত্যাদি যে কোন ধরণের সামান্যতম ঊনিশ-বিশ করা স্ত্রীজাতির ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বরং কুফুরের পর্যায়ভুক্ত। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দিনী এই নির্যাতিতা মহিলা কি যে অপরাধ করেছিল তা আল্লাহই জানেন। মানুষের কাছে মানুষ এই নিরীহ জীবে পরিণত হয়—তা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে। হে মানুষ! একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভুর সামনেই তোর এ ভয়-ভীতি ও নম্রতা সাজে। হে প্রভু! এ অধমকে ভয় ও বিনয়ের সাথে তোমার এবাদত করার শক্তি দাও। শহুরে বিয়েতে বেগানা ভদ্রলোকেরাও নববধুর মুখ দেখে থাকেন। আল্লাহ সবাইকে এসমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করুন।

পঁয়ত্রিশ—মুখ দেখার পর্ব শেষ হলে একটা শিশুকে নববধুর কোলে বসিয়ে তার হাতে মিষ্টি দিয়ে শিশুটিকে আবার উঠিয়ে নেওয়া হয়। টোটকার বুঝি আর অন্ত নেই। এরপরও তো অনেকে আপন শিশুর মুখ দেখেন না, তবুও কি এ মন্দ ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ যায় না?

ছত্রিশ—জেহেয যখন খোলা হয় তখন বধুর সাথে আসা মহিলাকে পরনের কাপড় দান করা হয়। জেহেযের কিছু অংশ বরের বোন-ভাগ্নিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কি আশ্চর্য নিয়ম—'মান ইয়া না মান ময়তের মেহমান। কেউ হয়তো দাবী করতে পারেন—এ রীতি তো সবাই মানে। আমি বলি, সবাই জানে যে এ রীতির বিরোধিতা করলে কুৎসার শিকার হতে হবে, তাই সবাই মানতে বাধ্য হয়। এমন হলে নিজের ধন ডাকাতি হতে দেখেও যে প্রাণের ভয়ে মুখ খুলল না তাকেও রাজী বলে ধরে নিতে হয় এবং ডাকাতকে মাল দিয়ে দিতে হয় আপোষে।

সাইত্রিশ—বিকালে আছর ও মাগরিবের মধ্য সময় নববধুর চুল খোলা হয়। তখন গায়িকারা অকথ্য ভাষায় গান শুরু করে। গালির চোটে নতুন বৌ তাদেরে কিছু নজরানা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হন। এ ক্ষেত্রেও অনাবশ্যককে আবশ্যক করার এবং গানের পারিশ্রমিক প্রদানের পাপ হয়।

আটত্রিশ—বধু শ্বশুরালয়ে আসার পরদিন তার বাপের বাড়ী থেকে মিষ্টি নিয়ে গাড়ী আসে। একে 'চৌথী' বলা হয়। এটাও একটা অন্যবশ্যক কুপ্রথা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া এটা আসলে এতদ্দেশীয় হিন্দুয়ানী রীতি, আর

বিজাতীয়দের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সবাই ভালো করে অবহিত।

ঊনচল্লিশ—কনের ভাই-ভাতিজার সাথে অনেক গায়র মুহাররম পুরুষও চৌথী নিয়ে আসেন। মুহাররম কি গায়র মুহাররম সেটা বাছ-বিচার না করেই সবাইকে বধুগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। বধুসাজেসজ্জিত নারীকে গায়র মুহাররম পুরুষের পাশে একলা ঘরে বসতে দেওয়া কতবড় লজ্জার কথা,—কতবড় বেইজ্জতি! চৌথী নিয়ে আসা আত্মীয়গণ কনেকে কিছু নগদ অর্থ দিয়ে যান এবং তাকে সামান্য মিষ্টি খাওয়ান। তৈল, আতর, কাজের লোকের খরচ ইত্যাদি সহ চৌথীর জিনিষপত্র শাশুড়ীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসব অনর্থক বাজে কাজ ছাড়া কিছুই নয়।

চল্লিশ—এর পরদিন চৌথীওয়ালারা বর-কনেকে নিয়ে ফিরাযাত্রায় কনের বাপের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। চৌথীর অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রী তারা সাথে নিয়ে যান। যা নিয়ে গেলেন তাই আবার ফেরত নিয়ে আসার মানেটা কি? নাকি কোন বরকত লাভের আশায় মেয়ের শ্বশুরালয়ে চৌথী প্রেরণ করা হয়েছিল? বুদ্ধি বিবেচনার মাথা খেয়ে এ ধরণের কুপ্রথা পালনে কি শান্তি? এতো পাপের বোঝা বড় করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

একচল্লিশ—বর শ্বশুরালয়ে গেলে শ্যালিকারা তার জুতা লুকিয়ে রেখে টাকা আদায় করে। একে তো চুরি তার উপর আবার পুরস্কার! ঢং করে কারো জিনিস লুকানো হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। গায়র মুহাররম পুরুষের সাথে হাসি-তামাশা করে মন-খোলা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী কাজ। তামাশার পুরস্কার প্রদানকে অত্যাবশ্যক মনে করা শরীয়তী বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। কোন কোন অঞ্চলে জুতা চুরির রেওয়াজ না থাকলেও পুরস্কার গ্রহণের কুপ্রথাটি বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। চৌথী খেলা নামে শহরাঞ্চলে রং নিয়ে খেলার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে তা আরো নিন্দনীয়। এক অবর্ণনীয় নির্লজ্জতা এ খেলায় দৃষ্টিগোচর হয়। যে সকল স্বামী তাদের স্ত্রীদেরে এ খেলা থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট না হন তারা কি ভদ্রজন হতে পারে? উপরন্তু, এ খেলায় কাফেরদের অনুকরণ করার গোনাহ বলাই বাহুল্য।

বিয়াল্লিশ—দু'চার দিন পর বরপক্ষ আবার বধুকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যান। এ যাত্রা 'বহুড়া' বলে পরিচিত। চৌথীতে পালিত সকল কুসংস্কার এ বহুড়ায়ও পালন করা হয়। চৌথীর বর্ণনায় তা আলোচিত হয়েছে।

তেতাল্লিশ—মুহররম ও শবে-বরাতের সময় নববধুর পিত্রালয়ে অবস্থান করা অপরিহার্য মনে করা হয়। সম্ভবতঃ মুহররম ও শবে-বরাতকে অকল্যাণকর ধারণা করেই এ রসূমের প্রবর্তন হয়েছে। (নাঊযুবিল্লাহ্) অতএব, এ সময় স্বামী গৃহে অবস্থান কুলক্ষুণে। আকিদা-বিশ্বাসের বিকৃতি কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে লক্ষ্য করেছেন?

চুয়াল্লিশ—ঈদের সময় মেয়ের বাড়ীতে চাউল, আটা, ময়দা ইত্যাদি পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে। সাথে সাথে বর-কনেকে কাপড়-চোপড়ও দেওয়া হয়ে থাকে। এ কাজকে এতই জরুরী মনে করা হয় যে সুদে ঋণ নিয়ে হলেও তা করতেই হবে। শরীয়তের সীমালংঘন আর কাকে বলে?

পঁয়তাল্লিশ—এতদ্দেশীয় হিন্দুদের অনুকরণে কোন কোন স্থানে বরের হাতে রংগীন কাগজ বেঁধে দেওয়া হয়। বিজাতীয় অনুকরণের দোষে একাজ নিষিদ্ধ।

ছেচল্লিশ—কোন কোন অঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠানে আতশবাজী করার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। হাদীসে আতশবাজীকে নির্ভেজাল অপব্যয় ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাতচল্লিশ—দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

আটচল্লিশ—বর-কনেকে কোলে করে গাড়ী বা পাল্কী থেকে ঘরে তোলার রেওয়াজ চরম অভদ্রতা।

ঊনপঞ্চাশ—বিয়ের দিন-তারিখ নির্ধারণের বেলায় কোন কোন সময়কে অশুভ ধারণা করা হয়। সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে এর প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হয়, যেন তারা যাকে অশুভ মনে করেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মন্দ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। (নাঊযুবিল্লাহ্) আঠার বৎসর বয়সকে অশুভ ধারণা করা হয়। এ বিশ্বাস যেমন শরীয়ত বিরোধী তেমনি অযৌক্তিকও।

মোটকথা, উপরোক্ত কুপ্রথাগুলো অপব্যয়, অহংকার, সুনাম অর্জনের আকাংখা, অনাবশ্যককে আবশ্যক করা, কাফেরদের অনুকরণ, সুদে ঋণ গ্রহণ, বিনা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ, পর্দাহীনতা, শিরক, বিকৃত আকিদা-বিশ্বাস, নামায বা জামাত কাযা হওয়া, পাপ কাজে সহায়তা দান বারংবার পাপে লিপ্ত হওয়া এবং পাপ কাজকে প্রশংসা করা ইত্যাকার গোনাহে পরিপূর্ণ। কোরআন ও হাদীসে এই গোনাহসমূহের স্পষ্ট ভাষায় নিন্দাবাদ করা হয়েছে। নিম্নে তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেছেন, 'অপব্যয় করনা, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না।' অন্যত্র বলেছেন,—'অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই আর শয়তান প্রভুর অকৃতজ্ঞ।' হাদীসে আছে,—'যে ব্যক্তি অহমিকা প্রকাশক কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অহমিকার প্রতিফল দেবেন। আর যে শুনানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতে তাকে তার দোষ শুনিয়ে দেবেন।'

হাদীসে আরো আছে,—'তোমরা নিজেদের নামাযে শয়তানের অংশ রেখো না যে, নামায শেষে ডানদিকে ফিরে বসাকে অত্যাবশ্যক মনে করো।' এ হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, মুস্তাহাব কাজকে অবশ্যকরণীয় হিসাবে পালন করা শয়তানের সন্তুষ্টির কারণ। তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ বলেন,—মুস্তাহাব কাজ সর্বদা করলেই যখন এই অবস্থা, তখন মুবাহ্ কাজ সর্বদা করলে তো আরো অধিক পাপ হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি—যে একই গোনাহর কাজ সব সময় করে তার কি পরিণতি?

হাদীসে আছে—'সুদদাতা ও সুদগ্রহীতাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) লা'নত করেছেন।' ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে হাদীসে যে সকল কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা সকলেই জানেন। অযথা ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সেই সকল সতর্কবাণীই যথেষ্ট। হাদীসে আছে,—'মালিকের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া কারো সম্পদ হালাল হবে না।' এ থেকে বুঝা গেল, জোর করে দান গ্রহণ নাজায়েয। অন্য হাদীসে এসেছে,—'যে দেখে এবং যাকে দেখা হয় উভয়ই আল্লাহর লা'নতে পড়বে।' এ দ্বারা বেপর্দা চলাফেরা করার দোষণীয়তা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

শিরকের অবৈধতা সম্পর্কে সবাই পূর্ণ অবহিত। হাদীসে আছে, 'নামায পরিত্যাগ করাকে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কুফরী কাজ বলে মনে করতেন।' অপর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,—'আমার প্রাণ যার হস্তগত সেই সত্তার শপথ, আমার ইচ্ছা হয় প্রথমে লাকড়ী সংগ্রহ করে নিয়ে নামাযের আযান দেওয়াই, অতঃপর যারা জামাতে আসবে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।' এ হাদীসে জামাতে শামিল না হওয়াকে তীব্রভাবে তিরস্কার করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,—'পাপ ও অন্যায় কাজে তোমরা একে অন্যকে সহায়তা করো না।' হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,—'তুমি যদি সৎকাজ করে আনন্দিত হও এবং মন্দ কাজ করে দুঃখিত হও, তাহলে বুঝবে তুমি সাচ্চা ঈমানদান।' এ থেকে বুঝা গেল, গোনাহর কাজকে শোভনীয় ও ভদ্রতা মনে করা এবং বারংবার তা করতে থাকা ঈমাণ বিলুপ্তির পরিচায়ক। এ ধরণের অজ্ঞতাপ্রসূত কুপ্রথা সম্পর্কে হাদীসে কড়া ভাষায় তিরস্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—'তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিরাগ ভাজন হবে।' যে ইসলাম গ্রহণ করার পরও জাহেলিয়াতের কুপ্রথাসমূহ পালন করতে আগ্রহী, সে ঐ তিন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কিত আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে। কুপ্রথা পালনের দোষণীয়তা সকলের কাছেই পরিস্কার বিধায় সেগুলির উল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। অতএব, মুসলমানদের কর্তব্যবোধ, ঈমান ও বিবেকের দাবী হচ্ছে, শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক বিবেচনায় এ সকল কুসংস্কার দোষণীয় প্রমাণিত হওয়ার পর পূর্ণ সাহস নিয়ে তা পরিহার করা এবং নাম-বদনামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। শত অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আল্লাহর আনুগত্যে সম্মান ও খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

এ কুসংস্কারসমূহের মূলোৎপাটন দু'টি পদ্ধতিতে সম্ভব। প্রথমতঃ গোটা সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরোপের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের কুসংস্কার-প্রীতিকে উপেক্ষা করে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে তা পরিহার করে। এভাবে একজনের দেখাদেখি অন্যান্যরাও তা পরিহার করতে

সাহসী ও অনুপ্রাণিত হবে। অল্প দিনের মধ্যেই গোটা সমাজে এর আশাব্যঞ্জক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। এ মহৎ কাজের উদ্যোক্তা মৃত্যুর পরও অনবরত সওয়াব পেতে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, যার সামর্থ্য আছে সে করবে আর যার সামর্থ্য নেই সে করবে না। তাদের জবাবে বলবো, সামর্থ্যবানদের পক্ষেও গোনাহর কাজ করা জায়েয নয়। কুসংস্কার পালন অবৈধ প্রমাণিত হবার পর সামর্থ্য-অসামর্থ্যের কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না। তাছাড়া, ধনীরা করলে তো তাদের পাড়া-প্রতিবেশী গরীব লোকেরাও ইজ্জতের ভয়ে অন্ততঃ তাকে জরুরী মনে করবে। কাজেই সচ্ছলতা-অসচ্ছলতার প্রশ্ন বাদ দিয়ে সবাই একযোগে কুপ্রথা পরিত্যাগ করাটাই জরুরী মনে হয়।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, সমাজ থেকে এ সকল রীতি-প্রথা উচ্ছেদ করে ফেললে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সৌহার্দভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হৃদ্যতা বজায় রাখার সুবিধার্থে গোনাহর কাজ করা কি জায়েয হবে? অবশ্যই না। তাছাড়া হৃদ্যতা বজায় রাখতে হলে যে প্রথার অনুসরণ করতেই হবে এমনতো নয়। রসূম পালন না করেও বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে পারস্পরিক আনাগোনা, খাওয়া-দাওয়া, লেনদেন ইত্যাদি স্বাভাবিক নিয়মে চলতে পারে। এসব ছাড়া হৃদ্যতা আর কাকে বলে? ঝগড়া-ফ্যাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, অনুষ্ঠানের আয়োজনের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা ইত্যাদি না হলে বুদ্ধি পূর্ণ হৃদ্যতা প্রতীয়মান হয় না?

বিয়ের প্রস্তাবনায় মৌখিক প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট। ঘটক, জামাজোড়া, নিশানী, শিরনী ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। একজন খাদেম আর একজন সঙ্গীসহ বরকে দাওয়াত দিয়েই তো বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যায়। বিরাট বরযাত্রী বাহিনী নিয়ে কনের বাড়ীতে চড়াও না হয়ে বরং সামনে যে কয়জন আত্মীয়-স্বজনকে পাওয়া যায় তাদেরে বড়জোর সাথে রাখা চলে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র জেহেয নিসাবে দান করা উচিত। তাও আবার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নয় বরং বিনা প্রচারেই বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। বর-কনের শ্বশুরালয়ে ও পিত্রালয়ে যেকোন সময় গমনাগমনে কোন ধরণের প্রথাগত বাধা-বিপত্তি নেই। ওয়ালিমা সুন্নত হলেও তাতে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা চাই। অযথা অপব্যয় ও অহংকার প্রকাশের দুর্বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত

থাকতে হবে। যে সমস্ত অনুষ্ঠানে কুসংস্কার প্রথা পালন করা হবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, দ্বীনদারগণের সেসমস্ত অনুষ্ঠানের দাওয়াত প্রত্যাখান করা উচিত।

উপসংহারে আরেকটি কুপ্রথার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহলো,—মোটা অংকের মোহরানা নির্ধারণের রসূম। এটা হাদীসের খেলাফ। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন,—বড় অংকের মোহর রেখো না। কেননা, তা যদি দুনিয়ার জীবনে সম্মান লাভ বা আল্লাহ্ ভীতির উপায় হতো তাহলে সর্বপ্রথম রসূল (সাঃ) তা করতেন। রসূল (সাঃ) নিজ বিবিকে বা নিজ কন্যাগণকে বার আওকিয়ার বেশী মোহর নির্ধারণ করে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।' তিরমিযী শরীফে এ হাদীস খানা উদ্ধৃত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, বর যাতে স্ত্রীকে তালাক না দেয় সেইজন্যই বেশী করে মোহর রাখা প্রয়োজন। এ অজুহাত সম্পূর্ণ অমূলক। যে ছাড়ার সে ছেড়েই দেবে, ছাড়লে কি হবে সেটা সে চিন্তা করেনা। আর যে 'স্ত্রী মোহর দাবী করবে' এই ভয়ে তালাক না দেয় সেতো স্ত্রীকে আরো বেশী যাতনা দেয়। তার হক্বও আদায় করে না, তালাক দিয়ে অন্যত্র বিয়ে বসতেও দেয় না। আসল কথা হচ্ছে, নিজেকে বিরাট প্রতিপত্তিশালী প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই মোটা অংকের মোহর ধার্য করা হয়। অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুবাহ কাজ করাও হারাম, আর সুন্নতবিরোধী কাজ হলে তো কথাই নেই। পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মোহর নির্ধারণ করতে হবে।

হযরত ফাতেমা যোহরার (রাঃ) বিবাহ

সর্বপ্রথম হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) একে একে হুযূর (সাঃ)–এর নিকট ফাতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু রসূল (সাঃ) এত অল্প বয়স্কা ফাতেমাকে বিয়ে দিতে সম্মত হননি। অতঃপর আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবদের চাপে, কোন কোন বর্ণনামতে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাঃ)–এর অনুপ্রেরণায় হযরত আলী (রাঃ) লজ্জাবনত মস্তকে হুযূর (সাঃ)–এর সামনে উপস্থিত হয়ে হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) তাঁর হাতে সোপর্দ করার প্রস্তাব দেন।

এ থেকে বুঝা গেল, বিয়ের প্রস্তাবনা তথা 'পান–চিনি' নামে বর্তমানে যেসকল রীতিনীতি পালিত হয়ে থাকে সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সুন্নত বিরোধী। মৌখিক প্রস্তাবনা ও প্রস্তাব গ্রহণই এর জন্য যথেষ্ট। বিয়ের সময় হযরত ফাতেমার (রাঃ)–এর বয়স ছিল সাড়ে পনর বৎসর আর হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন একুশ বৎসর বয়স্ক। এ থেকে জানা গেল, এর চেয়ে অধিক বয়স পর্যন্ত বিয়ে বিলম্বিত করা অনুচিত। এটাও জানা গেল যে, বর–কনের বয়সের ভারসাম্য রক্ষা করা উচিৎ এবং বরের বয়স কণের চাইতে বেশী হওয়া উচিত।

হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আনাস (রাঃ)কে বললেন,—'যাও, আবুবকর, উমর, উসমান, তালহা, যুবায়র (রাঃ) এবং আরো একদল আনসার সাহাবাকে ডেকে নিয়ে আস'। এ থেকে বুঝা গেল, বিয়ের অনুষ্ঠানে আপন লোকদেরে দাওয়াত করাতে কোন দোষ নেই। এতে করে বিয়ের প্রচার কার্যও হয়ে যায়। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানের সমাবেশ অযথা আড়ম্বরপূর্ণ না হওয়াই উচিত। উপস্থিত সময় যে কয়জনকে কাছে পাওয়া যায় তাদেরকে নিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করা যায়। উপরোক্ত সাহাবায়ে কিরাম সমবেত হওয়ার পর হুযূর (সাঃ) এক মর্মস্পর্শী খুতবা দিয়ে বিয়ের আকদ সম্পন্ন করে দেন। অতএব বুঝা গেল, মেয়ের পিতার পক্ষে সমবেত মেহমানদের চোখের আড়ালে অবস্থান করা সুন্নতের খেলাফ বরং খোদ পিতা মেয়ের আকদ পড়াবেন—এটাই উত্তম। ওকীলও। ওকীলের উপর ওয়ালীর প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত।

তুহ্ফাতুয যাওজাইন' যাওজাইন' ইত্যাদি কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর মোহর ছিল চারশ' মিসকাল রৌপ্য। বর্তমান হিসাবে চারশ' মিসকাল একশত পঞ্চাশ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ। অতএব বুঝা গেল, বিয়েতে অত্যধিক লম্বা–চওড়া মোহর নির্ধারণ করা সুন্নতের খেলাফ। বরং মোহরে ফাতেমীই যথেষ্ট এবং বরকতময়। বর মোহরে ফাতেমী আদায়ে অসমর্থ হলে তার চেয়ে কম মোহর রাখাই উত্তম হবে। আক্দ

সম্পন্ন করে হুযূর (সাঃ) উপস্থিত সকলের মাঝে এক তবক খেজুর ছড়িয়ে বিলিয়ে দেন। যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। বড় জোর একে সুন্নাতে যায়েদার পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে, কোন মুবাহ বা মুস্তাহাব কাজ যখন ফ্যাসাদ সৃষ্টির সহায়ক হয় তখন পরিত্যাগ করা উত্তম। খেজুর ছড়িয়ে বিলিয়ে দিতে গিয়ে আজকাল অনেক বিপাকের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই, হাতে হাতে বিতরণ করে দেওয়াই উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)–কে সঙ্গে দিয়ে হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–এর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। দুই জাহানের শাহজাদীর পিত্রালয় থেকে বিদায়ের এই ছিল দৃশ্য। —এতে কোন ধুমধাম ছিল না, বরযাত্রী বা পালকী ছিল না। হযরত (সাঃ) হযরত আলীর কাছ থেকে খাদেমদের পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেননি আর মহল্লাবাসী সকল আত্মীয়–স্বজনকে দাওয়াতও দেননি। আমাদেরও কর্তব্য হুযূর (সাঃ)–এর অনুসরণ করা এবং হুযূর (সাঃ)–এর সম্মান থেকে নিজেদের সম্মানকে বড় মনে না করা। এ জাতীয় ধারণা থেকে আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) হযরত ফাতেমার ঘরে প্রবেশ করে তাঁর কাছে পানি চাইলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) চার কোণ বিশিষ্ট একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসলেন। এ থেকে বুঝা গেল, নববধুর পক্ষে অত্যধিক লজ্জাবনত হয়ে চলাফেরা করা বা হাতে কোন কাজ করাকে দোষণীয় মনে করা সুন্নতের পরিপন্থী। হুযূর (সাঃ) আপন মুখের লালা পানিতে ফেলে সেই পানি হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর বুক ও মাথায় ছিটিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন–'হে প্রভু! একে ও তার সন্তান–সন্ততিকে বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম। অতঃপর ফাতেমাকে পিছন ফিরিয়ে তার পিঠে পানি ছিটিয়ে দিয়ে পুনরায় উপরোক্ত দোয়া করলেন। এরপর হযরত আলীর হাতে পানি আনিয়ে তার সাথেও একই ব্যবহার করলেন। তবে হযরত আলীর পিঠে পানি ছিটালেন না। এ থেকে বুঝা যায়, বিয়ের পরে বর–কনেকে একত্র করে এই আমল করা তাদের পক্ষে মঙ্গলকর। এ দেশীয় কুসংস্কারের এমনই রীতি যে, বিয়ের পরও স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে পর্দা রক্ষা

করতে দেখা যায়। নববধুর পা–ধোয়া পানি ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার যে রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে, 'তাযকিরায়ে মাওযুয়াত' কিতাবে তাকে বানোয়াট কুসংস্কার বলে প্রমাণ করা হয়েছে। অবশেষে হুযূর (সাঃ) তাদেরে বিসমিল্লাহ পড়ে ঘরে প্রবেশ করতে বলেছেন।

অন্য এক রেওয়ায়ত মতে, হযরত ফাতেমার (রাঃ) বিয়ের দিন এশার পরে হুযূর (সাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাতে আপন মুখের লালা ফেলেন এবং সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে দোয়া করেন। অতঃপর প্রথমে হযরত আলী ও পরে হযরত ফাতেমাকে সেই পানি পান করতে এবং তা দিয়ে অযু করতে আদেশ দেন। অবশেষে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ–শান্তি ও পুণ্যবান সন্তানাদির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মোনাজাত করেন। মোনাজাত শেষে এরশাদ করেন, 'যাও, আরাম কর গিয়ে।' জামাতার বাড়ী কাছে থাকলে এরূপ করা বরকতের কাজ। হযরত ফাতেমা (রাঃ)–এর বিয়ের সময় পিতা মেয়েকে যেসব জিনিসপত্র দান করেছিলেন তন্মধ্যে দুটি ইয়ামানী চাদর, দুটি তোষক, দুই জোড়া বালিশ, দুইটি রূপার বাজুবন্দ, একটি কম্বল, একটি তাকিয়া, একটি আহারপাত্র, একটি পানপাত্র, একটি যাঁতা কল, একটি পানি রাখার পাত্র এবং কোন কোন রেওয়ায়ত মত একটি পালংও ছিল। —(ইযালাতুল খিফা)

কন্যাকে জেহেয দানের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়—

এক—সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ আসবাব দান থেকে বিরত থাকা। দুই—দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দান করা উচিত। তিন—মেয়েকে কিসব জিনিসপত্র দান করা হচ্ছে, তা সকলকে শুনানো বা প্রচার করে বেড়ানো ঠিক নয়। উপরোক্ত রেওয়ায়ত মোতাবেক এ তিনটি বিষয় হুযূর (সাঃ)–এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ) ও ফাতেমার (রাঃ) কার্যক্ষেত্র নির্দেশ করে বলেছেন—আলী (রাঃ) বাইরের কাজ করবেন আর ফাতেমার দায়িত্বে ভিতর বাড়ীর কাজ। এ দেশীয় ভদ্র ঘরের মেয়ে নিজ ঘরের কাজ করতে কেন

লজ্জাবোধ করেন তা আমার বোধগম্য হয় না। হযরত আলীর (রাঃ) ওয়ালিমায় সামান্য কয়েক সা' যব, কিছু খুরমা ও ময়দা ছাড়া আর তেমন কিছুই ছিল না। প্রকাশ থাকা আবশ্যক, এক সা' প্রচলিত ওজনে তিন সের ছয় ছটাক। অতএব বুঝা গেল, সাধ্যাতিরিক্ত খরচ না করে এবং লোক দেখানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করে সামর্থ্যের ভিতর থেকে যতদূর সম্ভব নিজের বিশেষ বিশেষ আপন জনদেরে দাওয়াত দিয়ে পানাহার করানোই সুন্নতসম্মত ওয়ালিমা।

মুমিন জননীদের বিবাহ

হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর বিয়ের মোহর ছিল পাঁচশ' দিরহাম বা তার সমমূল্যের উট। হযরত (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেব এ মোহর আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) মোহর ছিল দশ দিরহামের জিনিসপত্র। হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) ও হযরত সাওদা (রাঃ) প্রত্যেকের মোহর ছিল চারশ' দিরহাম। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর মোহর চারশ দিনার ছিল, যা আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) বাদশা পরিশোধ করেছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর ওয়ালিমায় যবের তৈরী খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর ওয়ালিমায় একটি বকরী যবেহ করে আমন্ত্রিত মেহমানদের গোশত-রুটি পরিবেশন করা হয়েছিল। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের যার কাছে যা ছিল তা-ই একত্র করে হযরত সাফিয়্যা (রাঃ)-এর ওয়ালিমা সম্পন্ন হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিজে বলেন, আমার ওয়ালিমায় উট-বকরী ইত্যাদি কোন কিছুই যবেহ করা হয়নি। হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর ঘর থেকে আনীত এক পেয়ালা দুধ দিয়ে আমার ওয়ালিমা হয়।

রসূল (সাঃ)-এর অতি আদরের তনয়াগণ নবী-সহধর্মিনীগণের বিয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সিয়ারের কিতাবসমূহের আলোচ্য বিষয়। এখানে শুধু একটি মাত্র বিয়ের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে অন্যান্যগুলো মোহর ও ওয়ালিমা সম্পর্কিত

আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমান কালে বিয়েশাদীর অনুষ্ঠানাদিতে প্রচলিত আড়ম্বর ও অপব্যয় যে রসূলে আকরাম (সাঃ)এর অনুসৃত রীতি পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী সেটা দেখানোই এখানে আসল উদ্দেশ্য। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সেই উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে হাসিল করা যেতে পারে। প্রকাশ থাকা আবশ্যক, এক দিরহাম প্রায় সোয়া চার তোলা রৌপ্যের সমান এবং দশ দিরহামে এক দিনার হয়। হিসাব করে দেখুন হুযূর (সাঃ)-এর প্রদত্ত মোহরের পরিমাণ কত অল্প ছিল। 'হুযূর (সাঃ) অসচ্ছল ছিলেন' বলে কেউ একে উড়িয়ে দিতে পারবে না, কেননা, তিনি (সাঃ) ইচ্ছা করলে সারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ তাঁর পায়ে পড়ে গড়াগড়ি যেত। একটা বিয়েতে যে চারশ' দিনার মোহর ছিল,তাও এক বাদশাহ প্রদান করেছিলেন। সে চারশ' দিনারও তো আমাদের দেশে প্রচলিত মোহরের তুলনায় অনেক কম। নবী (সাঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই অবলম্বিত রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট।

বিয়ে-শাদীর মাসায়েল

এখন বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত কিছু নিত্য-প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। সর্বসাধারণ বিশেষতঃ কাযী সাহেবগণের এতদসংক্রান্ত জ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই। জ্ঞানের অভাবের কারণেই অনেক সময় বিয়ে-শাদী বিনষ্ট হয়ে যায়।

মাসআলা ঃ এক—অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন নাবালেগা মেয়ের বিয়ে সিদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং কনের মৌখিক সম্মতিও গ্রহণযোগ্য নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কনের প্রথম বিয়ে ও দ্বিতীয় বিয়েতে এ হুকুমের কোন তারতম্য নেই।

দুই—কোন জরুরী কারণে পিতা অথবা দাদা যদি অপ্রাপ্তা বয়স্কা কন্যাকে গায়র কুফু অর্থাৎ অসম স্থানে বিয়ে দেন তাহলে সে বিয়ে সিদ্ধ হবে ; তবে সেই কারণেব প্রকাশ্য বিরোধী কোন কারণ পাওয়া গেলে তা সিদ্ধ

হবে না। পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক অপ্রাপ্ত বয়স্কাকে গায়র কুফুতে বিয়ে দিলে সে বিয়ে সিদ্ধ হবে না।

তিন—স্বয়ং কনের সম্মতি ব্যতিরেকে বালেগা কন্যার বিয়ে জায়েয হবে না। এটা যদি তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় তাহলে মৌখিক সম্মতি প্রয়োজন। প্রথম বিয়ের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রার্থী যদি ওয়ালি বা অভিভাবক হন তাহলে কনের নিরবতাকেই সম্মতি বলে ধরে নেয়া যাবে, তবে সম্মতিপ্রার্থ অভিভাবক না হলে কনের মৌখিক সম্মতি ব্যতীত বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

চার—প্রাপ্তবয়স্কা কনে যদি বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত সমপর্যায়ভুক্ত (কুফু) পুরুষের নিকট বিয়ে বসে যায় তাহলে তা জায়েয হবে, তবে গায়র কুফুতে বিয়ে বসলে বিয়ে জায়েয হবে না। অবশ্য কোন মেয়ের যদি ওয়ালিই না থাকে অথবা গায়র কুফুতে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবার পর বৈধ অভিভাবকগণ তাতে সম্মত হয়ে যান তাহলে সে বিয়ে নাজায়েয হবে না।

পাঁচ—ওয়ালি যদি বালেগার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং পরে কনে সে সংবাদ শুনেও চুপ করে থাকে তাহলে বিয় সিদ্ধ হয়ে যাবে। ওয়ালি নয় এমন ব্যক্তি কনের সম্মতি চাইলে সে যদি চুপ করে থাকে তাহলে বিয়ে সিদ্ধ হবে না, তবে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত যদি অসম্মতি প্রকাশ না হয় তাহলে তখন বিয়ে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

ছয়—ইজাব ও কবুল সশব্দে করা উচিত—যেন উপস্থিত সাক্ষীগণের পক্ষে তা শুনতে অসুবিধা না হয়।

সাত—সর্বপ্রথম ওয়ালি পিতা, অতঃপর পর্যায়ক্রমে দাদা, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর একই নিয়মে তার সন্তানাদি, অতঃপর আপন চাচা, পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, চাচাত ভাই ইত্যাদি ক্রমানুয়ে, অর্থাৎ, ফরায়েযের আসাবাদের ক্রমানুসারে ওয়ালি হিসাবেও গণ্য হবেন। যখন আসাবাদের মধ্যে কেউ থাকবে না, তখন মা, দাদী, নানা, সহোদরা বোন, বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, কুফু, মামা, খালা, চাচাত বোন ইত্যাদি ওয়ালি হওয়ার ব্যাপারে অগ্রে উল্লেখিত জন পশ্চাতে উল্লেখিত জনের উপর প্রাধান্য পাবেন।

আট—নিকটবর্তী ওয়ালির বর্তমানে দূরবর্তী কেউ ওয়ালি হতে পারবেন না।

নয়—তালাক তিন প্রকার—রেজয়ী, বায়েন আর মুগাল্লায। রেজয়ী তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে যদি স্বামী ইদ্দতের ভিতরে ফিরিয়ে নেয় তাহলে পূর্বের বিয়েই ঠিক থাকবে, অন্যত্র বিয়ে জায়েয হবে না। আর ইদ্দতকালীন সময়ের ভিতরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিলে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে। মুগাল্লাজ তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা জায়েয নয়। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগে সেই মহিলারও অন্যত্র বিয়ে জায়েয হবে না। ইদ্দতের পরে জায়েয।

দশ—ইদ্দতের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, স্বামীর কাছে যাওয়ার পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়। অল্প বয়স্কা বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে যদি হায়েয না হয় তাহলে তালাক প্রদান করার দিন থেকে গণনা করে তিন মাস পর্যন্ত সময়কে ইদ্দতকাল বলে গণ্য করতে হবে। আর যদি হায়েয হয় তাহলে তিন হায়েযকে ইদ্দত কাল ধরতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসবের দিন পর্যন্ত তার ইদ্দত কাল ধরা হবে। স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশদিন পর্যন্ত বিধবাদের ইদ্দত। তবে বিধবা গর্ভবতী হলে এ ক্ষেত্রেও বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত সময়কে তার ইদ্দত ধরা হবে।

যে স্ত্রীলোকের যে ইদ্দত বর্ণিত হলো তা পক্ষে সেই সময় কালের ভিতর অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে না। কাফের মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার স্বামী কাফেরই থেকে যান, তাহলে তিনিও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার হুকুমের অধীন—মুসলমান স্বামীর কাছে বিয়ে বসতে চাইলে তাকেও ইদ্দত পালন করতে হবে। তিন হায়েয গত না হওয়া পর্যন্ত এবং গর্ভবতী অবস্থায় বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত সেই নও-মুসলিম মহিলার পক্ষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে না। অনেকেই এদিকে লক্ষ্য করেন না।

এগার—বিয়ের সময় বর-কনের মাঝে রক্ত সম্পর্কীয় বা দুধ সম্পর্কীয় বাধা-নিষেধ আছে কিনা তাও ভালো করে দেখে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন

পর্দার মাসায়েল

এক—পুরুষের নাভী থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত শরীর ঢাকা ফরয। কোন পুরুষ অথবা নারীর সামনে তা উন্মুক্ত করা নাজায়েয। তবে নিজ স্ত্রীর কাছে শরীরের কোন অংশ ঢাকাই জরুরী নয়। অবশ্য অযথা দেহ প্রদর্শন ভালো নয়।

দুই—স্ত্রীলোকের পক্ষেও অন্য স্ত্রীলোকের সামনে নাভীর নীচ থেকে হাটু পর্যন্ত দেহাংশ উন্মুক্ত করা জায়েয নয়। বুঝা গেল, গোসল করানোর সময় কোন কোন স্ত্রীলোক যে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সামনে নগ্ন হয়ে যায় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

তিন—শরয়ী মুহাররামের (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম) সামনে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ এবং পেট-পিঠে খোলা স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম। শরীরের অন্যান্য অংশ অর্থাৎ মাথা, চেহারা, বাহু, এবং হাটুর নিম্নাংশ প্রকাশ করা জায়েয আছে। অবশ্য কোন কোন অংশ বিনা প্রয়োজনে প্রকাশ করা অনুচিত। আর শরয়ী মুহাররাম বলতে ঐ সমস্ত পুরুষলোককে বুঝায়, যাদের সাথে জীবনে কোন দিন বিবাহ বন্ধন বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, যেমন,—

'পিতা, পুত্র, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, বেপিত্রেয় ভাই, তাদের সন্তানাদি, ঐ তিন প্রকারের বোনের সন্তানাদি এবং অন্যান্য যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর যাদের সাথে জীবনে কখনো বিহবন্ধন বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা শরীয়তমত মুহাররম নন বরং গায়র মুহাররম। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ট হোক না কেন, অপরিচিত ও ভিন্ন পুরুষের বেলায় শরীয়তে যে নির্দেশ এদের বেলায়ও সেই একই নির্দেশ। এ ধরণের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে রয়েছেন— চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, ও খালাতো ভাইগণ, দেবর-ভাশুর, ভগ্নিপতি এবং ননদ পতি ইত্যাদি। ভিন পুরুষের সাথে পর্দা করার যে হুকুম, এদের সাথে পর্দা করারও সেই হুকুম। এদের পক্ষ থেকে অশুভ সাধন সহজতর হওয়ায় এক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে।

চার—বর্তমানে দুস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলেমগণ কোন কোন মুহাররমকেও গায়র মুহাররম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামাজিক শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশে এ ধরণের সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যুবক শশুর, যুবতী শাশুড়ীর জামাতা, স্বামীর অপর স্ত্রীর পক্ষের ছেলে এবং দুধ সম্পর্কীয় ভাইকে এই পর্যায়ের গায়র মুহাররমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ জাতীয় গায়র মুহাররমদের দ্বারা কত কাণ্ড-কীর্তি যে সবাজে অহরহ ঘটে যাচ্ছে তা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন।

পাঁচ—শরীয়ত অনুযায়ী গায়র মুহাররম পুরুষদের সামনে মাথা, বাহু, হাটুর নীচের অংশ ইত্যাদি প্রকাশ করাও হারাম। খুব বেশী প্রয়োজন দেখা দিলে, যেমন বিশেষ প্রয়োজনে কোন মহিলাকে ঘরের বাইরে যেতে হলে অথবা কোন নিকটাত্মীয়কে ঘন ঘন ঘরে ঢুকতে হয় অথচ ঘরের ভিতরে সব সময় পর্দা করার মত পরিসর নেই, এমতাবস্থায়, চেহারা, উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং উভয় পায়ের ঘণ্টা পর্যন্ত খোলা রাখা জায়েয হবে। তবে শরীরের অপরাপর অংশ খোলা রাখা জায়েয হবে না। এ পরিস্থিতে মহিলাদের কর্তব্য হচ্ছে, ভালো-করে মাথা ঢেকে রাখা। লম্বা হাত ওয়ালা জামা পরবে, আটসাট পায়জামা পরিধান না করা, হাতের কব্জি ও পায়ের টাখনু খোলা না রাখা এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে শরীরের এ অংশটুকু প্রকাশ না করা। বরং সর্বদা ঘরের ভিতরে অবস্থান করবে এবং কোন শরীয়তি বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া সময় বোরকা পরে বের হবে, আর এটাই হচ্ছে ভদ্রতা—শালীনতা।

কোন কোন অপরিণামদর্শী এ পর্দাপ্রথাকে শরীয়ত সম্মত নয় বলে উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, পর্দাপ্রথাকে শরীয়ত এবং বিবেক উভয়ই একটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরূপে মনে করে। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গোহীকৃত 'লাত্বাইফে রশীদিয়া' পুস্তিকায় পর্দার মাসায়েলগুলি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে, অনুসন্ধানী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

ছয়—উপরে বর্ণিত শরীরের যে সকল অংশ প্রকাশ করা হারাম সেগুলির

প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম যদিও তা ভাবলেশহীন ভাবেও হয়। আর যে দেহাংশকে প্রকাশ করা ও দেখা জায়েয আছে, ভাবলেশের সামান্যতম সম্ভাবনা থাকলে তা প্রকাশ করা বা দেখা হারাম হবে। এ থেকে বুঝা গেল, দুর্বল বৃদ্ধা নারী যার প্রতি ভাবাবেগ জনিত আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই, তার চেহারা দেখাতো জায়েয আছে তবে মাথা, বাহু ইত্যাদি দেখা জায়েয হবে না। এ সমস্ত স্ত্রীলোকগণ ঘরের ভিতরে থাকা অবস্থায় পর্দার প্রতি সাবধান থাকে না, গায়র মুহাররম আত্মীয়-স্বজনের সামনে হাতকাটা জামা পরে নির্দ্বিধায় বসে থাকে,—এভাবে নিজেও পাপী হয় এবং পুরুষদেরেও পাপী বানায়।

সাত—চিকিৎসার প্রয়োজনে দৃষ্টি-নিষিদ্ধ দেহাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয তবে প্রয়োজনরে অতিরিক্ত দেখা জায়েয হবে না।

আট—শরীয়তের দৃষ্টিতে গায়র মুহাররম নারী-পুরুষের কোন নির্জন গৃহে অবস্থান করা হারাম। তেমনি ঐ গৃহে আরেক গায়র মুহাররম নারীর উপস্থিতিতেও পুরুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া বা অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে সেখানে যদি ঐ নারীর কোন মুহাররম বা তার স্বামী কিংবা ঐ পুরুষের কোন মুহাররমা নারী বা তার স্ত্রী উপস্থিত থাকে তাহলে কোন দোষ নেই।

নয়—যে দেহাংশ দেখা জায়েয তবে স্পর্শ করলে ভাবের উদ্রেক হয় তা দেখা তো জায়েযই হবে কিন্তু স্পর্শ করা হারাম। তবে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। এ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব অন্যদিকে মন রাখবে, মনে মন্দভাব আসতে দেবে না।

দশ—কাফির ধাত্রীর সামনে শরীরের যে অংশ খোলা প্রয়োজন সে অংশও খোলা জায়েয নয়। এ দেশীয় মহিলারা—মাতারী ও মালিনীদের গমনাগমনের বেলায় এদিকে খুব কম সতর্কতাই অবলম্বন করেন।

এগার—ধাত্রী যদি কাফির না হয়, তাহলে অন্তঃসত্বা নারীর শরীরের কেবল প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া মাথা-বাহু ইত্যাদি খোলা জায়েয নয়।

বার—গায়র মুহাররম নর-নারীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনাও নিষিদ্ধ। প্রয়োজন থাকলেও অতিরিক্ত কথা বলবে না, হাসি-ঠাট্টা করবে না, কোমল স্বরে কথা বলবে না।

তের—পুরুষ স্ত্রীলোকের কিংবা স্ত্রীলোক পুরুষের গানের আওয়াজ শুনা নিষিদ্ধ। এতে বুঝা গেল, বর্তমানে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে উচ্চস্বরে বা মাইকের সাহায্যে স্বর করে মুনাজাত ও কসীদা ইত্যাদি স্ত্রীলোকদেরে শুনানোর যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

চৌদ্দ—ফেকাহবিদগণ যুবতী মুহাররমা স্ত্রীলোকের সালাম গ্রহণ করতে বা তাদেরে সালাম করতে নিষেধ করেছেন।

পনর—গায়র মুহাররমা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের ঝোটা পানাহার আর গায়র মুহাররম পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের ঝোটা পানাহার করা আকর্ষণ জনিত স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হলে মাকরূহ হবে।

ষোল—গায়র মুহাররমের পোষাক ইত্যাদি দেখলে যদি হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক হয় হয় তাহলে সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও হারাম।

সতর—যে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার প্রতি পুরুষেরা আকৃষ্ট হয় তার হুকুম প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার মতো, অর্থাৎ, পর্দা করবে।

আঠার—মন্দ খেয়ালে গায়র মুহাররামের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তার শব্দ শোনা, তার সাথে আলাপ করা, তাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি যেমন হারাম, তাকে অন্তর-মধ্যে স্থান দেওয়া ও তার কোনকিছুর স্বাদ গ্রহণ করাও তেমনি হারাম—এ মানসিক ব্যভিচার।

ঊনিশ—তেমনিভাবে, গায়র মুহাররমকে স্মরণ করা, তার আলাপ শোনা, তার ছবি দেখা, তার সাথে চিঠি-পত্রে বিনিময় করা, এককথায় কুবাসনা উদ্রেককারী যাবতয়ি কাজই হারামের পর্যায়ভুক্ত!

বিশ—কোন পুরুষের পক্ষে গায়র মুহাররম স্ত্রীলোকদেরকে বিনা প্রয়োজনে দেখা-শুনা করার যেমন অনুমতি নেই, তেমনি স্ত্রীলোকের পক্ষে গায়র মুহাররম পুরুষকে আড়াল তেকে দেখাও জায়েয নয়। বর ও বয়যাত্রীদেরকে আড়াল থেকে দেখার যে অভ্যাস আমাদের নারী সমাজে বিদ্যমান তা বড়ই মন্দ স্বভাব।

একুশ—শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড় পরা বিবস্ত্র থাকারই শামিল। হাদীসে এ ধরণের পোষাকের নিন্দা করা হয়েছে।

বাইশ—গায়র মুহাররম স্ত্রীলোক দ্বারা পুরষের গা টেপানো জায়েয নয়

তেইশ—গায়র মুহাররম পুরুষগণ শব্দ শুনতে পাবে এমন অলংকার অথবা গায়র মুহাররম পুরুষের নাকে পৌঁছে এমন সুগন্ধী ব্যবহার করা স্ত্রীলোকদের জন্য জায়েয নয়,—এটাও একপ্রকার বেপর্দা সুলভ কাজ। আর যে অলংকারে শব্দ হয় না, তবে অন্যকিছুর সাথে লেগে শব্দ হয় এ জাতীয় অলংকার পরে সতর্কভাবে হাটা-চলা করা ওয়াজিব—যেন তা বাজতে না পারে।

চব্বিশ—ছোট মেয়েদেরেও ঘুংঘুর জাতীয় শব্দকারী অলংকার পরতে দেওয়া উচিত নয়।

পঁচিশ—গায়র মুহাররম মুর্শিদও অন্যান্য গায়র মুহাররম পুরুষদের ন্যায়। বেপর্দা অবস্থায় পীরের সামনে বের হওয়াও গোনাহর কাজ। পীর সাহেব এবং শিষ্যা উভয়েই যদি খুব বেশী বৃদ্ধ হন তাহলে শুধু চেহারা, কব্জি পর্যন্ত হাত এবং টাখনুর নীচ পর্যন্ত পা খোলা রাখা জায়েয হবে। তবে শরীরের অন্যান্য অংগ প্রকাশ করা কিংবা একাকিনী পীরের নিকট বসা জায়েয না।

ছাব্বিশ—জীবন্ত অবস্থায় যে দেহাংশ দেখা জায়েয নয় মৃত্যুর পরও তা দেখা জায়েয হবে না। তেমনি দেহ থাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও তা দেখা জায়েয নয়। স্ত্রীলোকের নাভীর নিম্নদেশের লোম মাথার এবং চুল কর্তিত হলে তা দেখাও পুরুষের পেক্ষ জায়েয নয়। এ থেকে বুঝা গেল, মাথায় চিরুনী করলে যে চুল উপড়ে আসে তা যত্রতত্র পুরুষ লোকের দেখার স্থানে ফেলে দেয়া স্ত্রীলোকদের পেক্ষ জায়েয নয়।

সাতাশ—হিজড়া, খোজা, নপুংসকরা গায়র মুহাররম পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এদের থেকে সতর্ক থাকা কর্তব্য।

আটাশ—দাড়ী-গোফ না উঠে বলক কোন কোন ব্যাপারে অপরিচিতা মহিলার হুকুমে পড়ে। কামভাব নিয়ে এমন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তার সাথে মোসাফা করা, তার কাছে একাকী বসা, তার গান শুনা, তার উপস্থিতিতে গান শুনা, তাকে দিয়ে শরীরের কোন অংশ টেপানো অথবা তার সাথে অত্যধিক স্নেহবাৎসল্য ও সরলতা বশতঃ আলাপ-আলোচনা করা ইত্যাদি সবকিছু হারাম।

উনত্রিশ—স্ত্রীলোকদের পক্ষে ভ্রমন কালে পর্দার অভাবে নামায কাযা করা জায়েয নয় এবং গরুর গাড়ীতে বসে বসে নামায পড়াও দুরস্ত নয়। বরং চাদর বা বোরকা পের গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় বোরকা পরাই পর্দার জন্য যথেষ্ট।

ত্রিশ—কোন মুহাররম পুরুষ সফর সঙ্গী না থাকলে একাকীনী স্ত্রীলোকের সফর করা হারাম। এমনকি, সে সফর যদি হজ্জের উদ্দেশেও হয় তবুও। অর্থাৎ, মুহাররম পুরুষ সাথে না নিয়ে একাকিনী হজ্জের সফরও জায়েয নয়।

একত্রিশ—স্ত্রীলোকদের মসজিদে বা কবরস্থানে যাওয়া মাকরূহ। তবে, অত্যধিক বৃদ্ধা মহিলা মসজিদে যেতে পারেন।

বত্রিশ—কেউ কেউ যুবতী মেয়েদেরে অন্ধ বা কানা শিক্ষকের কাছে বিদ্যা-শিক্ষা করতে দেন। একাজ সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

পাকভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা বিধবার দ্বিতীয় বিবাহকে লজ্জাজনক কাজ বলে মনে করে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ একই মর্যাদা রাখে, যুক্তির দিক দিয়েও তা সমান। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোন কারণ নেই। ভারতীয় কাফেরদের সাথে মেলা-মেশা এবং সহায় সম্পত্তির প্রতি আসক্তির কারণে এধরণের ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ ভিত্তিহীন লোকাচারকে তাসের ঘরের সাথে তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে না। ঈমান ও বুদ্ধি তো বলে, প্রথম বিবাহ যেভাবে কোন ধরণের বাধা-বিঘ্ন থাকে না দ্বিতীয় বিবাহেও তেমনিভাবে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অনুচিত।

দ্বিতীয় বিবাহে যদি সংকোচ বোধ হয় তাহলে প্রথম বিবাহে তা হবে না কেন? বরং দ্বিতীয় বিবাহকে দোষণীয় মনে করলে, শরীয়তের বিধানকে নীচতা ও অসম্মানের হেতু ভাবার দরুণ এতে করে কুফরী হওয়ার আশংকা আছে। দ্বিতীয় বিবাহের প্রচলন ঘটানোর জন্য আমার এ প্রচেষ্টার প্রধান কারণ হচ্ছে, কোন কোন পরিস্থিতে প্রথম বিবাহের মতো দ্বিতীয় বিবাহও

ফরয হয়ে পড়ে। উদাহরণতঃ যুবতী মেয়েলোক যার বাহ্যিক পোষাক–আশোকে অন্তরের বাসনা প্রস্ফুটিত হয়, একাকিনী থাকলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা, খাদ্য–বস্ত্রের অভাব, অভাবের কারণে পর্দা ও ধর্ম বিনষ্ট হওয়ার আশংকা, এমতাবস্থায় এই মেয়েলোকের দ্বিতীয় বিবাহ করা নিশ্চিতই ফরয হবে। পরিস্থিতি দেখে ততটা প্রয়োজন অনুভূত না হলেও দ্বিতীয় বিবাহ ফরয হতে পারে। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, যে কাজ করতে সংকোচ বোধ হয় এবং যাকে লজ্জা ও নগ্নতা বলে ধারণা করা হয় সে কাজকে ব্যাপকভাবে প্রচলিত না করা পর্যন্ত লোকের এ সংকোচ বোধের অবসান হবে না। কাজেই আলেমদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এ কাজকে যাতে দোষণীয় মনে করা না হয় তার পরিবেশ সৃষ্টি করা। তবে যেহেতু এ কাজের প্রচলন একে কার্য্যে পরিণত করার উপরই নির্ভর করে, সেহেতু এর বাস্তব সম্মত প্রচলনের চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

আমাদের সমাজে ধর্ম ও ধার্মিকতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় অথচ শিক্ষার্থীগণ বড় বড় পদলাভের আশায় দ্বীনি শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজী, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি পঠনে নিমগ্ন। এই বিষয়গুলি শিক্ষা করা অনুচিত তা অভিজ্ঞতা থেকে পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, যেহেতু কোরআনের সতর্কবাণী দ্বারা তা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ - (البقرة ١٠٢)

'তারা এমন বিষয় শিক্ষা করে যা না কোন অপকার করে আর না কোন উপকারে আসে।' ইংরেজী শিক্ষার্থীগণ প্রায়ই বলে থাকেন—'ইংরেজী তো একটা ভাষা, ভাষা শিক্ষায় ক্ষতি কি? কিন্তু তারা একথা বুঝতে রাজি নন যে, ভাষা শিক্ষা তো খারাপ কিছু নয়, তবে যে শিক্ষা মানুষের নৈতিক উন্নতির সহায়ক নয় বরং অবনতির সহায়ক আদতে বৈধ হলেও এমতাবস্থায় সে শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উত্তম। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, হাটা–চলা করা তো মুলতঃ সম্পূর্ণ বৈধ কারজ, কিন্তু সেই হাটা–চলাই যখন

চুরি বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে হবে তখন হারাম হবে একথা সবাই স্বীকার করবেন।

বড় বড় পদলাভের উদ্দেশ্যেই কেবল এ সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে থাকে ছাত্ররা। এসব পড়াশুনা করে তারা শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে।যে শিক্ষার মাধ্যমেই এসব শরীয়ত বিরোধী কাজের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে সে শিক্ষাই পরিত্যাজ্য—গর্হিত। এ শিক্ষা গ্রহণের অন্যান্য অপকারিতা হচ্ছে,—ধর্মের প্রতি অমনোযোগী হওয়া, ধর্মীয় বিশ্বাসে ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া, মনে আত্মগর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট এবং ইলম ও আমল বিশুদ্ধ থাকলেও প্রতিপত্তিশালী হবার আকাংখার দরুন সে শিক্ষা গ্রহণ উচিত হবে না।

তবে কেউ যদি নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম বা ধর্মীয় প্রয়োজনে এসব শিক্ষা করে তাহলে দোষণীয় নয়। এ কাজের জন্যে অবশ্য কোন সনদের প্রয়োজনের হয় না। কেবল শিক্ষাই যথেষ্ট। ধর্মীয় প্রয়োজনে শিক্ষার্জন করছেন বলে কোন শিক্ষার্থীর দাবী শুধুমাত্র তখনই সঠিক বলে ধরা হবে যখন তার সনদ লাভের চেষ্টা না থাকবে। এই ধরনের বিকৃত চিন্তাধারা থেকেই আকিদাগত ভ্রান্তি ও ধর্মীয় ব্যাপারে অসতর্কতার উৎপত্তি হয়। এ ছাড়াও অনেকে এই উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, এতে করে সমাজে একটা সম্মানের পাত্র হওয়া যাবে এবং কেউ স্বল্পজ্ঞানী বলতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যও সঠিক নয়। পরিশেষে এ সমস্ত শিক্ষা যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল থাকা দরকার।

নবম অনুচ্ছেদ

লেখক ও প্রকাশকগণের স্বত্ব ক্রয়–বিক্রয় বা রেজিষ্ট্রী করাও এক ধরনের কুপ্রথার। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের নিকট এ বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিস্কার যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বত্ব মূলতঃ কারো অধিকারে রাখার বস্তু নয়। কাজেই এতে কোন এক ব্যক্তির অধিকার খাটানো এবং অন্যদেরে তা থেকে উপকার লাভে বাধা দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।'

দশম অনুচ্ছেদ

গণ্যমান্য, জ্ঞানী-গুণী ও ব্যবসায়ীগনের অনেকেই ঘোড় দৌড়, মেলা, নৌকা বাইচ, নাটক থিয়েটার ইত্যাদি খেল-তামাশার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন। এ সকল আয়োজনাদিতে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ ক্রিয়া-কর্মই শরীয়তবিরোধী। ঢোল ও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া এসব কল্পনাই করা যায় না। বেশ্যা নারীদের গমনাগমন তো আছেই। ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলাও হয়। নৌকা বাইচে যুবক পুরুষেরা হাটুর উপর কাপড় তুলে রাখে। কাফেরদের অনুসরণে মেলায় কত রকমের অবৈধ কার্যকলাপ চলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরোক্ত বহুবিধ কারণে এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করা গোনার কাজ এবং সাথে সাথে কুফরী ক্রিয়াকলাপ এগুলোর প্রচার-প্রসারের পক্ষে সহায়তাও করা হয়।

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন জাতির আয়োজনকে সম্প্রসারিত করবে সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি রসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে জনপথে সভা অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এ ধরনের জায়গায় লোকজন গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। অন্য হাদীসে রসূল (সাঃ) কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে কাবা ঘরকে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী এক জনগোষ্ঠীকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়ার সংবাদ প্রদান করেছেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! এ জনগোষ্ঠীতে তো ব্যবসায়ীগণও থাকতে পারে। রাসূলাল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন, যারা থাকবে তারা সবাই ভূ-গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

ব্যবসায়ী ভাইয়েরা! আপনারা তো শুধু নিজের সাময়িক প্রয়োজনের দিকেই চেয়ে আছেন। উপরোক্ত হাদীস আর কোরআন শরীফের স্পষ্ট ঘোষণা 'আল্লাহই রিযিকের মালিক' ইত্যাদি পাঠ ও অনুধাবন করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

মিলাদ শরীফ নামে পরিচিত অনুষ্ঠানও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান তিন প্রকৃতির মিলাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেকটির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

প্রথম প্রকার ঃ—এই প্রকার মিলাদ মাহফিলে কোন ধরনের নিয়মাবলী বা শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় না। অর্থাৎ, এ মিলাদ মাহফিলে কোন্টা করা যাবে বা কোন্টা করা যাবে না এ ধরনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। উদাহরণতঃ মিলাদের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ ছাড়াই কিছু লোক আকস্মিকভাবে কোন স্থানে একত্রিত হয়ে সেখানে কোন কিতাব পাঠ করে বা বক্তৃতার মাধ্যমে নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ (সাঃ)এর জন্ম, জীবন, আদর্শ, দৈনন্দিন চাল-চলন, মু'জেযা ও কৃতিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ আলোচনা করা। আলোচনা প্রসঙ্গে সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি হুকুম-আহকাম ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা বলতে কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা শরীয়তের বিধি-বিধান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মাহফিলে নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা। এই প্রকারের মিলাদ মাহফিল নির্ভেজাল জায়েয বরং মুস্তাহাব ও সুন্নাত। এই ভাবেই রসূল (সাঃ) স্বীয় জীবন ও মর্যাদার আলোচনা করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে মিলাদের এই পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম একে আজ পর্যন্ত যথারীতি প্রচলিত রেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ বিশুদ্ধ নিয়ম অনুসৃত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার—এই প্রকার মিলাদে এমন শরীয়ত বিরোধী নিয়মাবলী মেনে চলা হয় যে, সেগুলো স্বয়ং দোষণীয় ও পাপ কাজ। যেমন—অবাস্তব মনগড়া হাদীস আলোচনা করা, সুরেলা কণ্ঠে গজল আবৃত্তি করা সুদ-ঘুষের

হারাম অর্থ ব্যয়ে মাহফিলের আয়োজন করা, প্রয়োজনাতিরিক্ত আলো ও জায়গার ব্যবস্থা করা, নামায বা জামাতের উপর যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে এসব মাহফিলের প্রচার কার্য চালানো, গল্পে ও কবিতায় প্রকাশ্যে বা ইশারা-ইঙ্গিতে আঁহযরত (সাঃ) ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর শানে অশালীন শব্দাবলী ব্যবহার করা, মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে নামায জামাত ত্যাগ করা, অসময়ে নামায পড়া, মাহফিলের উদ্যোক্তার মনে সুখ্যাতি অর্জনের তীব্র বাসনা উদয় হওয়া. উক্ত মাহফিলে রসূল (সাঃ) উপস্থিত আছেন বলে বিশ্বাস করা বা এই ধরনের শরীয়ত বিরোধী অন্যান্য কার্যকলাপ। সাধারণ মূর্খ মুসলমান সমাজে প্রচলিত এই প্রকারের মিলাদ মাহফিল শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও গোনাহর কাজ।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ بِهٖ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ وَمُسْلِم)

'যে জেনে-শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করলো সে যেন দোযখে তার আবাস খুঁজে নেয়।' তিনি (সাঃ) আরো এরশাদ করেছেন—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ـ (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি কোন কিছু শুনে না বুঝেই তা বর্ণনা করতে শুরু করে দেয় তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার জন্য তার এ কাজটুকুই যথেষ্ট।'

এ হাদীস দু'খানা থেকে জানা গেল যে, হাদীস বর্ণনায় অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। পুরাপুরি ভাবে তাহকীক না করে হাদীস বর্ণনা করলে গোনাহ হবে। বিশেষ করে রসূল (সাঃ)-এর নামে কোন ভুল তথ্য

পরিবেশন করা অত্যন্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বায়হাকী হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—'পানি যেমন করে শষ্যক্ষেতকে ফসলে পরিপূর্ণ করে, গান তেমনি করে মানুষের মনকে মুনাফেকীতে পরিপূর্ণ করে।' এই হাদীসে গানের অপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে যখন ফিতনার সম্ভাবনা থাকে, যেমন সুকণ্ঠি নারীর গান, তখন তো তার অপকারিতার মাত্রা অত্যধিক হয়ে যায়।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়ত করেছেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল মালকেই শুধু কবুল করে থাকেন।' অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'যার খাদ্য পানীয়, ঘর-বাড়ী,পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু হারাম উপায়ে অর্জিত, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তার চুল-দাড়ি ও পোশাক আশাক জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেলে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে সারাদিন ইয়া রব, ইয়া রব বলে মোনাজাত করলেও তাতে কোন ফলোদয় হবে না। তার মোনাজাত কবুল হবে না। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন লোক যতই একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, হারাম উপার্জন সবকিছুকে বিনষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ـ (بنى اسرائيل ٢٧)

'তোমরা অপচয় করো না।' আরো এরশাদ করেছেন,—নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই আর শয়তান তার প্রভুর অকৃতজ্ঞ।' শরীয়ত অননুমোদিত খাতে সকল প্রকায় ব্যয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। তা' সে আলোতেই হোক আর অন্যান্য সা-সরঞ্জামেই হোক—নিষিদ্ধ। প্রথম অধ্যায়ে বেশ-ভূষায় ভিন্ন জাতির অনুকরণের অবৈধতা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তা এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।

তিরমিযী শরীফে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন—

عَنْ حُذَيْفَةَ رض أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলেছি, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দিলে অতিসত্বর আল্লাহ তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমরা অভিশপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।'

সুনানে আহমদে হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ)-কে কোন এক খৎনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান 'রসূল (সাঃ)-এর যামানায় আমরা খৎনা অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং এসময় কেউ দাওয়াতও দিত না।' এ থেকে বুঝা গেল, যে কাজে লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া সুন্নত নয় সে কাজে আমন্ত্রণ দান ও গ্রহণ করাকে সাহাবী (রাঃ) অপছন্দ করেছেন। শরীয়ত যে কাজকে যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। এই কারণেই চাশত নামায আদায় করার জন্য মসজিদে লোক সমাগম হতে দেখে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এই পদ্ধতি অস্বীকার করে একে বেদআত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এরই ভিত্তিতে ফেকাবিদগণ নফল নামাযের জামাতকে মাকরূহ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাদের সাথে বেয়াদবি করা যে অবিশ্বাসেরই নামান্তর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন মুসলমান তা অস্বীকার করতে পারে না। অনেক

জাহিল কবির রচনায় এই ধরনের বেয়াদবি পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় কবিতাদি রচনা করা যেমন নাজায়েয, তা পাঠ করা এবং শুনাও তেমনি নাজায়েয।সময় মত নামায আদায় না করাও হারাম। আর পাপের কারণ ঘটানোও পাপ। এই কারণেই হাদীসে এশার পরে আলাপ আলোচনা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেয়ওা হয়েছে। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, তাহাজ্জুদ বা ফজরের নামায নষ্ট হয়ে যাবার আশংকায় এ পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে।

লোক দেখানো ও অহংকার করা যে হারাম—তা সবাই জানেন। হারাম কাজের উপায় অবলম্বনও হারাম। হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি খ্যাতির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে কুখ্যাত করবেন।' হাদীসে আরো আছে, সামান্যতম রিয়াও শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কারো পক্ষে হাযির নাযির হওয়া তার জ্ঞান ও শক্তির উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তি দুটোই পূর্ণ মাথায় রয়েছে, কাজেই তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। কোন নবী বা রসূলকে সত্তাগতভাবে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানী ও শক্তিবান বলে বিশ্বাস করা শিরক হবে। এমনকি আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞান থেকে কিছু কম বলে বিশ্বাস করলেও তা শিরক। কেননা, একমাত্র আল্লাহর সকল জ্ঞান ও শক্তির আধার, অন্য কেউ নয়।

আরববাসীগণ নিজেদের দেব-দেবীকে আল্লাহর চাইতে কম ক্ষমতাবান মনে করতো, তা সত্ত্বেও কোরআন শরীফে তাদেরকে মুশরিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বাস যদি এই হয় যে, নবী-রসূল ও আওলিয়া কেরামগে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু জানিয়ে থাকেন এবং সর্বত্র বিরাজ করার শক্তি দেন তাহলে শিরক হবে না, তবে কোন শরয়ী প্রমাণ ব্যতিরেকে এ জাতীয় বিশ্বাসেও গোনাহ হবে। কেননা, অবাস্তবকে বিশ্বাস করা আত্মপ্রতারণা, আর প্রতারণাকে সবাই হারাম বলেই জানেন।

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'অমূলক ধারণা করা গোনাহর কাজ।'

হাদীসে আছে,—'অমূলক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।'

মোট কথা, এতসব নাজায়েয ক্রিয়াকলাপের দরুন মূল মাহফিলই নাজায়েয হয়ে যায়। অতএব, এ সকল মাহফিলে যোগদান করা জায়েয নয়। আজকাল

অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলগুলোর অধিকাংশতেই এ সকল ধ্যান ধারণা অন্তত দু'একটি হলেও থাকে। একটা নাজায়েয বিশ্বাস বা কাজই একটা মাহফিল নাজায়েয হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

তৃতীয় প্রকার ঃ এই প্রকারের মিলাদ মাহফিল প্রথম প্রকারের ন্যায় শর্তবিহীন বা দ্বিতীয় প্রকারের মত হারাম শর্ত সম্বলিত নয়, বরং এতে এমনসব নীতি–পদ্ধতি অনুসৃত হয় যা মূলতঃ মুবাহ ও হালাল। অর্থাৎ, এতে নির্ভরযোগ্য ও দ্বীনদার বর্ণনাকারীগণ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ ব্যক্ত করে থাকেন, এতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাও হালাল পন্থায় অর্জিত,এর আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় অপব্যয় করা হয় না, এতে উপস্থিত লোকজনের পরনে শরীয়তসম্মত পোষাক–আশাক থাকে, কারো কাছ থেকে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পেলে বক্তা নির্দ্বিধায় তা সংশোধন করতে প্রয়াসী হন, বক্তাগণ যথাপ্রয়োজনীয় হুকুম–আহকাম বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হন না, এতে গানের সুরে কবিতা আবৃত্তি করা হয় না, বক্তার আলোচ্য বিষয় শরীয়তের সীমা লংঘন করে না, মাহফিলের প্রচারকার্যে অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা হয় না, মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার কারণে অন্য জরুরী এবাদত আদায়ে অসুবিধা হয় না, সওয়াব লাভের আশা এবং রসূল (সাঃ)–এর মহব্বতের উদ্দেশ্য নিয়ে এ মাহফিল আয়োজিত হয়, শ্রোতাগণ রসূল (সাঃ)–কে হাযির–নাযির বলে বিশ্বাস করে না,—একথা নিশ্চিতভাবে জানা থাকা অবস্থায়ই কেবল রসূল (সাঃ)–এর শানে আহ্বান বোধক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং অন্যান্য যাবতীয় দোষ–ত্রুটি থেকে এ মাহফিল সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সাথে সাথে আদতে শরীয়ত–বিরোধী নয় এমন এমন সব কার্যকলাপ, যেমন, শিরনী বিতরণ, আতর ব্যবহার, বসার জন্য বিছানা বিছানো ইত্যাদিও পালন করা হয়। এ জাতীয় মাহফিল খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জাতীয় মাহফিলে যোগদান করা প্রথম প্রকারের মত নির্ভেজাল জায়েয অথবা দ্বিতীয় প্রকারের মতো একেবারে নাজায়েযও নয়। এ প্রকারের জায়েয হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে প্রথমে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুধাবন করে নিলে সেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

প্রথম নীতি ঃ—কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে জরুরী বা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা অথবা ফরয–ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব সহকারে তা পালন করা এবং একে পরিহার করা দোষণীয় ও ত্যাগকারীকে দোষারোপের যোগ্য বলে মনে করা—সবই নিষিদ্ধ। কেননা, এতে শরীয়তের সীমারেখা লংঘিত হয়। কোন শর্তহীন বিষয়ে শর্তারোপ করা, অনির্দিষ্ট বিষয়কে নির্দিষ্টকরণ, ব্যাপকতাকে সংকোচিতকরণ, অনাবশ্যককে আবশ্যকরণ, অসীমকে সীমায়িতকরণ ইত্যাদি এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন মজীদে আছে,– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে যে অনাচারী।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে,—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رض قال لَا يَجْعَل أَحَدُكُمْ
لِلشَّيْطٰنِ شَيْئًا مِنْ صَلٰوتِهٖ يَرٰى أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَن لَّا يَنْصَرِفَ
اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهٖ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا
يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهٖ - (متّفق عليه)

'নামাযের পর ডান দিকে ফিরে বসাকে অত্যাবশ্যক মনে করে তোমাদের নামাযে শয়তানকে ভাগ বসাতে দিও না। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে কোন কোন সময় বাম দিকে ফিরে বসতে দেখেছি।' মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাতা কুত্ববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস থেকে এ মূলনীতিই প্রমাণিত হয় যে, যে কেউ মুস্তাহাব বিষয়ের উপর সর্বদা আমল করে, এর উপর আমল করাকে জরুরী মনে করে এবং কখনও এর বিপরীত আমল করে না তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়ে শয়তান নিজের অংশ গ্রহণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি বেদআত ও শরীয়ত বিরোধী আক্বীদা ও আমল আঁকড়ে ধরবে তাকে তো শয়তান আগেই গোমরাহ করে ফেলেছে। মুজমা গ্রন্থকার বলেন, 'এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে,মানদুব (জায়েয) বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তা মাকরূহ হয়ে যায়।' এরই ভিত্তিতে হানাফী ফেকাহ্‌বিদগণ নামাযের

কেরাআতের জন্য সূরা নির্দিষ্ট করাকে মাকরূহ বলেছেন। ফতহুল কাদীরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম শরীফে আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,—সপ্তাহের অন্যান্য রাত্রির মধ্যে জুমআর রাত্রিকে জাগ্রত থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না এবং সকল দিনের মধ্যে জুমআর দিনকে রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না, তবে কারো নিয়ম-মাফিক রোযা যদি কোন শুক্রবারে রাখতে হয় তাহলে ভিন্ন কথা।'

দ্বিতীয় নীতি ঃ —মুবাহ ও মুস্তাহাব কাজসমূহও অনেক সময় শরীয়ত বিরোধী কাজের সাথে মিশ্রিত হয়ে নিষেধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন দাওয়াতে যাওয়া মুস্তাহাব বরং সুন্নাত, কিন্তু সেখানে যদি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে দাওয়াতে যাওয়া নিষিদ্ধ। হাদীস ও ফেকাহর কিতাবসমূহে এ মর্মে বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে, নফল নামায পড়া সওয়াবের কাজ কিন্তু তা মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া গোনাহর কাজ। এ থেকে বুঝা যায় শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কারণে শরীয়ত সম্মত বিষয়াদিও শরীয়ত বিরোধী হয়ে যায়।

তৃতীয় নীতি ঃ— অন্য মুসলমানদেরে ক্ষতি থেকে বাঁচানো ফরয। কাজেই ব্যক্তি বিশেষের কোন অনাবশ্যক কাজের দরুন যদি সাধারণ মুসলমানদের আক্বিদা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি বিশেষেড় পক্ষে তা করা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ হবে। ব্যক্তি বিশেষের এ জাতীয় কাজ পরিহার উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাঃ) হাতীমকে কাবা ঘরের ভিতরে ঢুকাতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই কাজ করলে যেহেতু নও-মুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত সংশয় সৃষ্টি হতে পারে এবং যেহেতু কাজটিও তেমন জরুরী ছিল না তাই রসূল (সাঃ) তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেননি। হুযূর (সাঃ) খোলাখুলিভাবে এই কারণ ব্যক্ত করেছিলেন। অথচ হাতীমকে কাবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়াটাই উত্তম ছিল, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের আক্বিদাগত ক্ষতির সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই তা বাস্তবায়িত না করাকে উত্তম মনে করা হয়েছে।

ইবনে মাজা হতে হযরত ইবনে মাসঊদের (রাঃ) উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,—মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে প্রথম দিন আহার করানো সুন্নাত ছিল। কিন্তু সবাই যখন একে একটা অবশ্য পালনীয় প্রথা হিসেবে মনে করতে লাগলো তখন তা বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দেখুন সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনের হেফাযতের জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গ কি-না করে গেছেন?

হাদীসে শোকরানা সিজদাকে মুবাহ বলা হয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) মত গ্রহণ করে হানাফী ফেকাহবিদগণ একে এজন্য মাকরূহ বলেছেন যে, সাধারণ মুসলমানগণ একে একটা স্বতন্ত্র সুন্নাত হিসাবে পালন করতে শুরু করে দেবে। আলমগীরী কিতাবে বলা হয়েছে, নামায আদায়ের পর শোকরানা সিজদা করা মাকরূহ। কেননা, সাধারণ লোক একে সুন্নাত ও ওয়াজিব মনে করবে। আর যে মুবাহ কাজ সাধারণ্যে সুন্নাত বা ওয়াজিবের পর্যায়ে উন্নীত হবার আশংকা দেখা দেয় তা মাকরূহ হয়ে যায়। তবে কাজটি পালন করা যদি শরীয়তানুযায়ী জরুরী হয় তাহলে তা পরিত্যাগ না করে বরং মিশ্রিত বাজে বিষয়গুলি অপসারণ করে তা সংশোধন করে নিতে হবে। যেমন; কোন আহাজারীকারিনী মহিলা সাথে থাকার দরুন জানাযার সাথে যাওয়া থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না, কেননা, লাশ দাফন করা জরুরী কাজ। এক্ষেত্রে বরং ঐ মহিলাকে সাথে যেতে নিষেধ করতে হবে। অপরপক্ষে, দাওয়াতে যাওয়া যেহেতু জরুরী কোন কাজ নয় যেহেতু নিষিদ্ধ বিষয়ের কারণে তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আল্লামা শামী (রহঃ) এই জাতীয় মাসআলাসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ নীতি ঃ — যে সকল বিষয় সাময়িকভাবে 'মাকরূহ হবার কারণ' সম্পৃক্ত হয় সময়, স্থানও বিজ্ঞ আলেমগণের অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা হেতু যে সকল বিষয়ের হুকুম ও বিভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এ জাতীয় বিষয়কে 'মাকরূহ হবার কারণ' সম্পৃক্ত না থাকার দরুন এক সময় জায়েয বলা হয়, আবার অন্য সময় 'মাকরূহ হবার কারণ' সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে একই বিষয়কে নাজায়েয বলা হয়। অথবা, একই বিষয়কে একস্থানে জায়েয এবং অন্যস্থানে নাজায়েয বলা হয়। কোন ব্যাপারে সাধারণ লোকজন কি কি আকিদাগত ও কার্যগত ভ্রান্তি সৃষ্টি করে নিয়েছে তা অজানা থাকার

ফলে এবং উপরোক্ত বিভিন্নতার কারণে, কোন স্থানের মুফতী সাহেব কোন সময় জায়েয বলে থাকেন, সেই একই বিষয়ে সাধাণ মানুষের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাত কোন মুফতী সাহেব নাজায়েয বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। স্থান, সময় ও মানুষভেদে ফতওয়ার এই বৈপরিত্ব একটা বাহ্যিক মতভেদ এতে মৌলিক কোন মতভেদ নেই। হাদীস ও ফেকাহ গ্রন্থসমূহ থেকে এ জাতীয় বিষয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেশ করা সম্ভব।

রসূল (সাঃ)–এর জীবদ্দশায় নারীঘটিত ফেতনার সম্ভাবনা ছিল না বলেই তিনি (সাঃ) মহিলাদেরে মসজিদে এসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেই হুকুম রহিত করে দেন। ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) মধ্যকার অনেক মতবিরোধও এই পর্যায়ভুক্ত।

পঞ্চম নীতি ঃ— শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করলে যদি এমন কোন উপকার অর্জিত হয় যা অর্জন করা শরীয়ত মত আবশ্যক নয়, অথবা, যা অর্জনের অন্যান্য পন্থাও বিদ্যমান, তাহলে ঐ উপকার লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া বা যে কাজে লিপ্ত দেখে জনগণকে তা থেকে বিরত না করা জায়েয হবে না। সৎ উদ্দেশ্যে মুবাহ কাজ করলে তা এবাদতে পরিণত হয়, কিন্তু হাজারো উপকারিতা বিদ্যমান থাকলেও গোনাহর কাজ মুবাহ (জায়েয) হবে না। এ কাজ নিজে করা বা অন্যকে করতে দেখে নিষেধ না কোনটাই জায়েয নয়। এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমাণিত ও গৃহীত। উদাহরণতঃ বলা যায়, সম্পদ আহরণ করে গরীব–মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে চুরি ডাকাতি করা—তাতে গরীব জনগোষ্ঠী যতই উপকৃত হোক না কেন—কখনো জায়েয হবে না।

উপরোক্ত নীতিমালাকে ভালো করে উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এখন মৌলুদ শরীফের তৃতীয় প্রকার জায়েয কি নাজায়েয সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করা যাক। এই প্রকার মৌলুদ শরীফের নিয়ম–রীতি মূলতঃ মুবাহ, কাজেই মৌলিক দিক থেকে এতে কোন প্রকার ত্রুটি–বিচ্যুতি নেই। অতএব, এই ধরনের মিলাদ নিষিদ্ধও নয়। কিন্তু তা পালন

করতে গিয়ে যদি আক্বীদাগত বা কার্যগত কোন ভ্রান্তি সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে তখন তাকে নাজায়েয আখ্যা দেওয়া হবে। আর যদি কোন প্রকার অনিষ্টতা সম্পৃক্ত না হয় তাহলে বহাল তবিয়তে জায়েয থাকবে। দ্বিতীয় নীতি থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এখন লক্ষণীয় ব্যাপারে হচ্ছে, বর্তমান যামানায় এসব মুবাহ পালনে কোন ধরনের ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় কিনা। ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হলে তা নিষিদ্ধ বুঝতে হবে। এ ভ্রান্তি প্রমাণ করার জন্যে কোন তর্ক–বিতর্কের প্রয়োজন নেই, বরং একটু তলিতে দেখলেই তা ধরা পড়ে যায়। গত বছর কয়েকের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, সাধারণ লোকেরা প্রায় সবাই এসব রীতি–নীতিকে ধর্মীয় জরুরী বিষয়াদির চেয়েও বেশী গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তারা জুমআ বা জামাতের উপর এর এক–দশমাংশ গুরুত্বও প্রদান করে না, তারা এ রীতি–নীতি পালন না করাকে ফরয–ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার চেয়েও অধিক নিন্দনীয় ও দোষণীয় মনে করে। কেউ এ রীতিপ্রথাকে অস্বীকার করলে তো কথাই নেই, এমনকি কেবল না করার কারণেই তাকে সীমাতিরিক্ত গাল–মন্দ করা হয়। তার সাথে যে আচরণ করা হয় কাফের বেদ'আত পন্থী বা ফাসিক লোকের সাথেও তা করা শোভা পায় না। জনগণ যখন এ প্রথাকে ফরয–ওয়াজিবের চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে নিয়েছে তখন একে মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বলা নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে।

উপরে বর্ণিত প্রথম নীতি থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। নিষিদ্ধ প্রথাসমূহ মিশ্রিত হয়ে খোদ মাহফিলই নিষিদ্ধ হয়ে যায়—এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় নীতির প্রতিজ্ঞা। কোন বিজ্ঞ আলেম যদি সাধারণ জনগণের আক্বীদা বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে এসব প্রথা পালন করেন তাহলেও তিনি গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন না। কারণ, তার দেখাদেখি সাধারণ লোকেরা ভ্রান্ত আক্বীদা–বিশ্বাস নিয়ে এসব প্রথা পালন করবে, ফলে একটা নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রচার ও প্রসারে ঐ বিজ্ঞ আলেমও জড়িয়ে পড়বেন। বাস্তব অবস্থার নিরিখে অসম্ভব হলেও কোথাও যদি এসব প্রথাকে নিস্কুলষ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে ওসবকে জায়েয বলা যাবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আক্বীদায় বা কার্যে ভ্রান্তি প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ এ অনুমতি বহাল থাকবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, মৌলুদ শরীফ স্বয়ং রসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত না হলে তা আমরা কিভাবে পেলাম? এর জবাবে বলবো, এখানে তো তৃতীয় প্রকারের মৌলুদের আলোচনা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে মৌলুদের যে রীতি প্রচলিত হয়েছে তা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, সায়ুতী, ইবনে হাজার ও মুল্লা আলী ক্বারীর (রহঃ) মত বড় বড় ওলামায়ে কেরাম মৌলুদকে জায়েয বলে গেছেন। এ কথার জবাবে বলতে হয়, তাদের সাথেও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম দ্বিমত পোষণ করেছেন। অধিকন্তু, সে সময় সাধারণ মানুষ মৌলুদ সম্পর্কে আক্বীদাগত ও কার্যগত ভ্রান্তিতে না থাকায় তারা এর অনুমতি প্রদান করেছিলেন। বর্তমানে যুগের অবস্থা দেখলে তারাও একে নিষেধ করতেন। তাই চতুর্থ নীতি অনুসারে এটাকে নিষেধ করা হয়।

অনেকে দাবী করেন, এই ওসিলায় গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু আহার্য বা অর্থ-কড়ি দান করা হয়,এতে ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি পায়, জাহেলদের কানে শরীয়তী বিধি-বিধানের আলোচনা প্রবেশ করে। তাদের এসব দাবীকে সর্বোতভাবে মেনে নেওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ধনীদেরে শিরণী দেওয়া হয় আর গরীবদেরে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। এসব মাহফিলে হুকুম-আহকামের আলোচনা খুব কমই হয়ে থাকে। গরীবদেরে দান করা, ইসলামের শান-শওকত পন্থা থাকা সত্ত্বেও শরীয়ত বিরোধী পন্থা অবলম্বন করা যে জায়েয হবে না তা উপরোল্লিখিত পঞ্চম নীতিতে বর্ণিত হয়েছে। এতসব সন্দেহের জবাব দানের পর আশা করি কারো মনে এ ব্যাপারে সংশয়ের উদ্রেক হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ আমল করার শক্তিদান করুন।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ نَبِيِّكَ وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهٖ
وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ۔

হে আল্লাহ! আমাদের মনে তোমার ও তোমার রসূলের প্রকৃত মহব্বত সৃষ্টি করে দাও এবং তোমার নবীর (সাঃ) সুন্নাতের অনুসরণ করার তৌফিক দাও।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ওলি আল্লাহগণের মাযারে ওরস ও ফাতেহা পাঠের নামে যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে তাও এক প্রকার কুসংস্কার। যা এক সময় বুযুর্গানে দ্বীনের রূহের প্রতি সওয়াব পৌছানোর এবং নেককারগণের সংস্পর্শে এসে উপকৃত হবার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এতে নানা ধরনের কুপ্রথা বাসা বেঁধে ফেলেছে।

এক—কোন কোন স্থানে ওরস উপলক্ষে বেহায়া নারীরা নাচ-গান করে থাকে। প্রথম অধ্যায়ে নাচ-গানের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে কবরের কাছে গেলে মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে শংকিত হবার কথা, সেই কবরের কাছে গিয়ে নাচ-গান করা—কত বড় ধৃষ্টতা! উপরন্তু, কবরও যেই সেই কবর নয়, বরং আওলিয়ায়ে কেরামের কবর, যে আওলিয়াগণ অতিরিক্ত কথাবার্তাকে পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। এ সমস্ত ওরসে যোগদান করা যে ফাসেকী ও গোনাহের কাজ তা বলাই বাহুল্য। কেউ হয়তো বলবেন, আমরা তো যিয়ারতের নিয়তে সেখানে গিয়ে থাকি, সেখানে নাচ-গান হলে আমাদের কি ক্ষতি হবে? জবাবে বলবো, প্রথমতঃ ফাসেকী সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তার অপকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। গোনাহর প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যিয়ারতের উদ্দেশ্য থাকলে তা তো অন্য সময়ও করা যায়। ওরসের দিন যিয়ারত করা তো জরুরী নয়। তৃতীয়তঃ যিয়ারত কোন ফরয-ওয়াজিব নয় যে, গোনাহর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তা পালন করতে হবে। মুবাহ ও মুস্তাহাব পালনে যদি গোনায় জড়িত হবার সম্ভাবনা থাকে তা হলে সেই মুবাহ বা মুস্তাহাবকে পরিত্যাগ করাই ওয়াজিব। প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় নীতি থেকে এ বক্তব্যের পক্ষে সায় পাওয়া যায়। এছাড়া

ওরসের দিন যিয়ারত করতে গেলে অন্যান্যদেরে বিভ্রান্ত করা হবে এবং নাচ–গানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরে সহায়তা করা হয়। এই কারণেও ওরসের দিন যিয়ারত করতে যাওয়া অনুচিত। ইতিপূর্বে প্রথম অনুচ্ছেদের তৃতীয় নীতিতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

দুই—কোন কোন ওরসে নর্তকীদের বদলে কাওয়ালগণ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গান করে থাকে। এ সম্পর্কে আমি 'হক্কুস সামা' নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উক্ত পুস্তিকায় 'সামা'র নিয়মাবলী ও শর্তাবলী এবং বর্তমানে এতে যে সমস্ত অপকারিতা সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান কালে প্রচলিত সামার অনুষ্ঠানসমূহ তাসাউফের ইমামগণের মতানুসারে মোটেও জায়েয নয়।

তিন—কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট দিন লোকজন সমবেত হয়ে কোরআন খানি এবং শিরণী বিতরণ করা হয়। বর্তমানে অনেকেই এ ধরনের ওরসকে শরীয়তসম্মত বলে ধারণা করেন। কিন্তু এতেও যে সর্বদা পালন করা, অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টকরণ এবং অনাবশ্যককে আবশ্যক করে নেওয়ার মতো অশুভ কার্যাবলী নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান তা তারা চিন্তা করে দেখেননি। যদ্দরুন সাধারণ লোকজন আক্বীদাগত ভ্রান্তিতে পতিত হয়। অনেক সময় সুদে ঋণ গ্রহণ করে ওরস উদযাপন করতে দেখা যায়। অর্থলোভ তাদেরে এই কাজে প্রলুব্ধ করে। শরীয়ত ও যুক্তি উভয় বিবেচনায়ই এ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত নিন্দনীয়। কবরবাসীদেরে উপকৃত করা ও নিজে উপকৃত হওয়ার শরীয়তসম্মত উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মাঝে মাঝে বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার যিয়ারত করা, তাঁদেরে সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী দান–খয়রাত করা এবং নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। তাদের রূহকে সওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে দান–খয়রাত করার ইচ্ছা থাকলে নিজের বাড়ীতে গোপনে গরীব–মিসকীনদেরে নগদ অর্থ দিয়ে দিবে বা আহার করিয়ে দিবে। নির্দিষ্ট তারিখে বা প্রচার করে দান করার কোন প্রয়োজন নেই।

ওরসের সময় বা অন্য সময় আওলিয়া আল্লাহগণের মাজারের উপর চাঁদোয়া বিছানো বা টানানো মাকরূহ ও অপব্যয়। এ সম্পর্কিত সাধারণ

লোকদের আক্বীদা–বিশ্বাস শিরকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আওলিয়াগণের মাযারের উদ্দেশ্যে 'নযর–মানত' মানা আরো বিস্ময়কর ব্যাপার। অনেক দূর–দূরান্ত থেকে লোকজন এখানে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা, শর্টি ইত্যাদি করে থাকে এবং নিজেদের মানত পূরা করে থাকে। কেউ কেউ জ্বিন ছাড়ানোর জন্য মাযারে আসে। কেউ বা মাযারে বাতি জ্বালিয়ে দেয়, কবরকে পাকা করে দেয়। কোরআন–হাদীস সুস্পষ্ট ভাষায় এ সমস্ত প্রকার কুসংস্কার থেকে তওবা করার নির্দেশ দিয়েছে। রসূল (সাঃ) বলেছেন,—আল্লাহ তাআলা আমাকে কবরে কাপড় বিছিয়ে দিতে হুকুম করেননি।' এ হাদীস থেকে কবরে গিলাফ বিছানোর অবৈধতা প্রমাণিত হয়। আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন,—

يُكْرَهُ السُّتُوْرُ عَلَى الْقُبُوْرِ

'কবরের উপর চাঁদোয়া লাগানো মাকরূহ'। অনেকে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, মহিলাদের দাফন কার্যে কবরের উপর কাপড় টানিয়ে দেওয়া হয়, অনুরূপভাবে এ কবরে কাপড় টানালে জায়েয হবে না কেন? তাদের এ যুক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রথমতঃ কিতাবী দলীলের বিপরীতে কিয়াসের অবতারণা করা বৈধ নয়। দ্বিতীয়তঃ সেই কিয়াসও ঠিক হয়নি। কেননা, মেয়েলোককে দাফন করার সময় পর্দার উদ্দেশ্যে কাপড় টানানো হয়। কবরে মাটি দিয়ে দেওয়ার পর সে পর্দার কোন প্রয়োজন থাকে না। আসলে এতে করে মাযারে শায়িত বুযুর্গের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তার কবরকে সুসজ্জিত করা হয়। আর অপব্যয় তো আছেই। এই ধরনের প্রত্যেকটি কাজই পৃথক পৃথক ভাবে নিষিদ্ধ। আর সবগুলো একত্রিত হওয়া তো আরো বেশী গোনাহের কাজ। মাজারে চাঁদোয়া টানানোই যখন নাজায়েয তখন চাঁদোয়া দানের মানত করা কিভাবে জায়েয হবে? যে মানত পুরা করা নাজায়েয তা করাও নাজায়েয। এ ধরনের মানত পুরা করার জন্য মাযারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়াও নাজায়েয। বিশেষ করে সেই সফরে স্ত্রীলোকদেরে সাথে নিয়ে গেলে ফরয পর্দা লংঘিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, আক্বীদার বিকৃতি তো অবশ্যম্ভাবী।

হাদীসে আছে,—'কবর যিয়ারতকারিনী স্ত্রীলোকদেরে আল্লাহ অভিশপ্ত করবেন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ـ

'নবীদের কবরকে ইবাদতগাহ বানিয়ে নেওয়ার অপরাধে আল্লাহ তাআলা ইহুদী–নাসারাদেরে অভিশপ্ত করবেন'। আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ এই হাদীসখানাই যথেষ্ট। এই হাদীস দ্বারা কবরকে সিজদা করাও নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলো। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক সাহাবী একদিন হুযূর (সাঃ)–এর কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন, 'আমরা আপনাকে সিজদা করবো।' তিনি (সাঃ) ঐ প্রশ্নকারী সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কি আমার কবরে সিজদা করবে? সাহাবী (রাঃ) আরজ করলে, 'তখন সিজদা করবো না'। এ উত্তর শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি প্রদান করতাম।' রসূলুল্লাহর (সাঃ) কথার সারমর্ম হচ্ছে, মৃত্যুর পর কেউ সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত থাকে না,—একথা যখন স্বীকার করে নিয়েছ তখন বুঝতে হবে চিরঞ্জীব আল্লাহই সিজদা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। এ হাদীস দ্বারা জীবিত মৃত সবাইকে সিজদা করা হারাম ঘোষিত হলো। এ থেকে বুঝা গেল, যিন্দাপীরদেরে সিজদাহ করাও হারাম। অন্য এক হাদীসে আছে,–রসূলুল্লাহ (সাঃ) কবরে বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন।' হযরত জাবির (রাঃ) থেকে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে,—

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ)

'রসূলুল্লাহ (সাঃ) কবর পাকা করতে, কবর গাত্রে লিখতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।'

অনেকে মাযারে শিরনী রান্না করে বিতরণ করে থাকেন। এ কাজে আওলিয়ার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা থাকে এবং তাকে প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা হয়। এ জাতীয় আক্বীদা শিরক এবং এ জাতীয় আক্বীদাপন্থীর বিতরণ করা শিরনী খাওয়াও জায়েয হবে না। কোরআন শরীফের নিষেধাজ্ঞা—

وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ـ (البَقَرة ـ ١٧٣)

'আল্লাহ ভিন্ন অন্য নামে যবেহকৃত জন্তু খাওয়া হারাম'—এর অর্থের ব্যাপকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে অনেকে মনগড়া কথার আশ্রয় নিয়ে বলেন,—আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসকীনদের দান করা, মাযার এলাকায় অনেক মিসকীন জড়ো থাকে, তাই সেখানে শিরনী নিয়ে যাই।' এটা একটা হীলা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, ঐ মিসকীনরাই যদি আসার সময় রাস্তায় তার কাছে শিরনী চায় তাহলে মাযারের উদ্দেশ্যে আনীত শিরনীর সামান্যতম অংশও তখন তাদেরে দেবেন না। বরং তাদেরে বলবেন, 'যেখানে নিয়ে চলেছি সেখানে পৌঁছে যাই আগে, তার পর বিতরণ করবো। সুতরাং বুঝা গেল মিসকীন উদ্দেশ্য নয় বরং মাযারই উদ্দেশ্য। তাছাড়া, মাযার এলাকায় পৌঁছেই তো মিসকীনদের মধ্যে শিরনী বিতরণ করে দেয়া যায়, তা আবার মাজারের উপর রাখতে হয় কেন?

অনেকেই ফুলে ভর্তি চাদর ও ফুলের মালা বানিয়ে কবরে রাখেন। এ কাজের প্রমাণ স্বরূপ তারা বলেন, হুযূর (সাঃ) একটি খেজুরের ডালকে দুই টুকরা করে দুইটি কবরে গেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই ডাল দুটি শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত করবস্থিত লাশের কবরের আযাব হ্রাসপ্রাপ্ত হবে আশা করি।' তাদের দাবীর জবাবে বলবো, প্রথমতঃ অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরাম রসূল (সাঃ)–এর এ কাজকে তাঁর বৈশিষ্ট্য বলেছেন। তাদের মতে, অন্য কারো পক্ষে এ কাজ বৈধ হবে না। রসূলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য মনে না করে যদি সকলের পক্ষেই একাজ করা বৈধ বলে ধরে নেওয়া যায়, তবুও খেজুরের

ডালের উপর ফুলের চাদর বা মালাকে কিয়াস করা মোটেও যথাযথ হয় না। রসূল (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল—কাঁচা ডাল মুর্দার জন্য দোয়া করবে আর এখানে ফুল দেওয়ার উদ্দেশ্য তো কবরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। আর কবরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা নিষিদ্ধ—তা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়তঃ হুযূর (সাঃ) কবরের আযাব লাঘবের জন্য একাজ করেছিলেন, এখানে ফুলের মালা দেওয়াতে যদি একই উদ্দেশ্য থাকে তাহলে যে সমস্ত কামেল বুযুর্গের কবরের আযাব হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের কবরে ফুল দেওয়া হতো। কিন্তু বাস্তবতা যে তার বিপরীত তা বলাই বাহুল্য। অতএব বুঝা গেল, কবরের আযাব লাঘবের উদ্দেশ্যে ফুল দেওয়া হয় না বরং ওলী আল্লাহগণের নৈকট্য সন্তুষ্টি অর্জনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য—যার কোন প্রমাণ তাদের হাতে নেই। আর না ওলী-আল্লাহগণ তাদের এ আচরণে সন্তুষ্টি হন। এ সমস্ত সাজ-সজ্জায় তাদের কোন লাভ হয় না, তাদের রূহকে যখন সওয়াব পৌছানো হয় কেবল তখনই তারা খুশী হন।

বর্তমানে প্রচলিত ফাতেহা পাঠে নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ঃ

এক—অধিকাংশ লোকজন আওলিয়ায়ে কেরামকে মানুষের চাহিদা পূরণকারী ও বিপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করে তাদের মাজারসমূহে এই উদ্দেশ্যে ফাতেহা পাঠ ও নিয়াজ বিতরণ করে থাকে যে, এতে তাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হবে, সম্পত্তি ও সন্তান লাভ হবে, রিযিক বাড়বে এবং সন্তানাদির হায়াত বৃদ্ধি পাবে। এ জাতীয় আক্বীদা-বিশ্বাসকে প্রতিটি মুসলমান নির্ভেজাল শিরক বলেই জানে। এ ধরনের বিশ্বাসের বাতিল হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনায় সারা কোরআন শরীফ পরিপূর্ণ।

অনেকে বলেন, 'আমরা আল্লাহ তা'আলাকেই যাবতীয় ব্যাপারে ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করি, তবে আওলিয়াগণের ওছিলা (মাধ্যম) ধরা তো নাজায়েয নয়, তাই তাঁদেরে ওছিলা মনে করি।' তাদের কথার উত্তরে বলবো, ওছিলা ধরার অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টির কারখানায় সেই ওছিলার কোন দখল রয়েছে। যাতে করে, আল্লাহ তাদের হাতে সৃষ্টি কারখানা সোপর্দ করে দিয়েছেন মনে আপনারা স্বয়ং ওছিলাকেই প্রকৃত কর্তা বলে বিশ্বাস

করে ও ওছিলার অনুনয়-বিনয়ের ফলে আল্লাহ কোন কাজ করতে বাধ্য বলে বিশ্বাস করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ জাতীয় বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক। আরবের মুশরিকগণও এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করতো। তারাও দেব-দেবীদেরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত মনে করে আল্লাহ্‌র কাজে তাদের একটা বিশেষ অধিকার রয়েছে বলে বিশ্বাস করতো। অথচ আল্লাহকেই যাবতীয় ক্ষমতার আধার মনে করতো। যেমন, কোরআন বলে,—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

(العنكبوت ٦١)

মুশরিকদেরে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন।

অন্য আয়াতে আছে—

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ ـ (الزمر ٣)

(মুশরিকগণ বলে), 'আমরা কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় দেব-দেবীর পূজা করে থাকি।' এ আয়াতদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়। একটি কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, যখন দাতা প্রার্থীর প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হন, দাতার কাছে সে জিনিষ মওজুদ থাকে, দাতার দান করার ক্ষমতা থাকে, দাতাকে দান করতে বাঁধা দেওয়ার মতো বড় কোন শক্তি না থাকে এবং প্রার্থীকে প্রার্থিতবস্তু পৌছিয়ে দেবার মাধ্যম দাতার কাছে থাকে, তখনই কেবল কারো কাছ থেকে কোন বস্তু পাওয়ার আশা করা যায়।

এবার লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি মাযারে শায়িত বুযুর্গের কাছ থেকে সন্তান ও সম্পদ পাওয়ার আশা রাখে তাকে প্রশ্ন করা যায়—তোমার প্রয়োজনের কথা ওলীআল্লাহগণ কিভাবে জানবেন? সে যদি বলে, তারা তো আপনি-আপনিই সবকিছু অবগত—তাহলে শিরক করবে। আর যদি বলে আল্লাহ তাদেরে জানিয়ে দেন,—তাহলে তা অবশ্য অসম্ভব নয়, তবে আল্লাহ যে

তাদেরে জানাবেনই এমন নিশ্চয়তা তো নেই। শরয়ী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন সম্ভাব্য বিষয়কে অবশ্যম্ভাবী বলে বিশ্বাস করা গোনাহ ও আত্মপ্রতারণা বৈ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—'নিশ্চিত না হয়ে কোন বদ্ধমূল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না।' ঐ ব্যক্তিকে আরো জিজ্ঞেস করা যায়—আওলিয়াগণের কাছে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কোন ভাণ্ডার মওজুদ আছে কি? তাদের কাছে যে নিয়ামত রয়েছে তা তো অন্য জিনিস। সন্তান আর অর্থের গোদাম তাদের নাগালের বাইরে। সন্তান ও অর্থ দানের ব্যাপারে তাদের সত্ত্বাগত ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করলে শিরক হবে। আর যদি বলা হয়,—আল্লাহ তাআলাই তাদের এ ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তাহলে এ দাবীর পক্ষে শরয়ী প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক ও মনগড়া বলে বিবেচিত হবে।

কোরআন হাদীসে নবীগণের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে—'আমি নিজের কোন উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নই।' এ সুস্পষ্ট বর্ণনায় আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সত্ত্বাগত ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাকে আরো প্রশ্ন করা যায়—আল্লাহ আহকামুল হাকিমীন যে তাদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাঁধা দেবেন না—এটাই বা কি জানতে পেলে? কিভাবে নিশ্চিত হলে যে, তারা যা চাইবেন তা-ই হবে? এ বিশ্বাস থাকলে সম্পূর্ণ কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। সর্বশেষে আওলিয়াগণ কর্তৃক সম্পদ ও সন্তান পৌঁছিয়ে দেওয়ার মাধ্যম সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত সকল প্রশ্নের জবাবে কেউ যদি বলে,—'আওলিয়ায়ে কেরাম দোয়া করেন, আর আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে দেন।' তাহলে বলবো, আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে তো তারা দোয়া করতে পারবেন না। তারা যে জ্ঞাত হয়েছেন তার কোন প্রমাণ আছে কি? আর জানলেই বা তারা যে দোয়া করবেন তারও তো কোন প্রমাণ নেই। আর দোয়া করলেই যে কবুল হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আসল কথা হচ্ছে—ওসিলার যে অর্থ ধরেছেন তা মোটেও সঠিক নয়। হাদীসে ওসিলার যে অর্থ বিবৃত হয়েছে তা হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা—'হে প্রভু! তোমার অমুক নেক বান্দার বরকতে আমার অমুক প্রয়োজনটা মিটিয়ে দাও।' যেমনভাবে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)এর ওসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন। এ ধরনের ওসিলা ধরা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে ওসিলা সম্পর্কে জাহেলদের ধারণা, বা বিশ্বাস শিরকের শ্রেণীভুক্ত। স্মর্তব্য যে, শাস্ত্রগত ও বুদ্ধিগত জ্ঞানে যে সমস্ত পূর্ণতা আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য বলে প্রমাণিত হয়, অন্য কারো মধ্যে সে সমস্ত পূর্ণতা কল্পনা করা আক্বীদাগত শিরক। আর যে সমস্ত কাজ বা ব্যবহার একমাত্র আল্লাহর শানেই প্রযোজ্য হয়, অন্যের সাথে সেই সমস্ত ব্যবহার করা কার্যগত শিরক। এ মূলনীতিকে মেনে চললে ভ্রান্তিতে পতিত হবার আশংকা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

দুই—এ ক্ষেত্রেও মাকরূহ প্রথাসমূহ পালন করাকে অত্যাবশ্যক মনে করা হয়।

তিনি—অনেক জাহেল ব্যক্তি শিরনীর সামান্য অংশ একটা পাত্রে করে মাযারের পাশে রেখে ফাতেহা পড়ে থাকে। তাদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় তোমাদের প্রস্তুতকৃত সকল খাদ্যের সওয়াব পৌঁছাতে চাও নাকি শুধু এই পাত্রে আনিত খাদ্যের সওয়াব? তারা অবশ্যই বলবে, সকল খাদ্যের সওয়াব পৌঁছানোই আমাদের উদ্দেশ্য।' অতঃপর যদি জিজ্ঞেস করা হয়,–সওয়াব পৌঁছানোর জন্য কি খাদ্য সামনে রেখে ফাতেহা পাঠ করা জরুরী? তাই যদি তাহলে তো তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ীই কেবল পাত্রে আনীত খাদ্যের সওয়াব পৌঁছবে।' আর যদি বল,'খাদ্য সামনে রাখা জরুরী নয় বরং নিয়তই যথেষ্ট, কাজেই সকল খাদ্যের সওয়াব পৌঁছবে।' তাহলে, পাত্রে খাদ্য রাখার প্রয়োজনটা কি? এ ক্ষেত্রে কি নিয়তকে যথেষ্ট মনে করতে অসুবিধা হয়? না কি আল্লাহর কাছে নমুনা পেশ করে বলতে হয় যে 'হাড়িতে এই জাতীয় খাদ্য রয়েছে। এর সওয়াব পৌঁছে দাও।' মোট কথা এর কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই, কেবল প্রথা বলেই একে মানতে হয়। তা-ও আবার এমনভাবে যে, এই বিশেষ রীতি অনুসরণ না করলে যেন সওয়াব উদ্দিষ্ট মুর্দার রূহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

চার—যে বস্তুর সওয়াব পৌঁছানো উদ্দেশ্য সে বস্তুকে যিয়ারতের সময় সামনে রাখা যদি জরুরী হয়, তাহলে নগদ টাকা, কাপড়, গম-চাউল ইত্যাদির বেলায় সে নিয়ম পালন করা হয় না কেন? আর যদি সে বস্তু সামনে রাখা জরুরী না হয়ে থাকে, তাহলে খাদ্য বস্তুতে এ নিয়ম কেন পালন করা হয়? নাকি এ ব্যাপারে খাদ্য বস্তু ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে তারা কোন পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন? দুনিয়া কিয়ামত হলেও তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন শরয়ী দলীল পেশ করা সম্ভব হবে না।

পাঁচ—খাদ্য খাওয়ানো বা বিতরণের আগে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সওয়াব বখশে দেওয়ার রীতি সাধারণ্যে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার—প্রথমতঃ কাউকে সওয়াব পৌঁছানোর অর্থ হচ্ছে,–'কোন ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করার ফলে যে সওয়াব পাওয়ার আশা রাখে, সেই সওয়াবটুকু নিজের পক্ষ থেকে অন্যকে প্রদান করা।' দ্বিতীয়তঃ কিসের সওয়াব হয়? খাদ্যের না খাদ্য বিতরণের? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খোদ খাদ্য কোন সওয়াবের জিনিষ নয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,—'কোরবানীর জন্তুর গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না বরং তোমাদের তাকওয়া তার নিকট পৌঁছে থাকে।' এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, জিনিষের সওয়াব নয় বরং আমলের সওয়াবই পৌঁছে। অতএব, স্বয়ং খাদ্যের নয় বরং খাদ্য খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। এ বিষয় দুটি উপলব্ধি করার পর প্রশ্ন আসে—শিরনী তৈরী করে কাউকে দান করার আগেই কি সওয়াব মিলে যায়? না মিললে মৃত ব্যক্তিকে কি পৌঁছাবেন? আর যদি বলেন, সওয়াব আগেই মিলে যায়? তাহলে, কোন কাজ করার আগে সওয়াব কিসের পারেন—সেটাও তো দেখার বিষয়।

মোট কথা, এ কাজটাও একটা অনর্থক বাজে কাজ। জাহেলদের কোন কোন কর্মকাণ্ড দেখে বুঝা যায়—সে যেন স্বয়ং খাদ্যকেই সওয়াব লাভের উপায় মনে করে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, কোন কোন নযর-নিয়াজ নিজেরাই খেয়ে ফেলে, বড় জোর কিছু বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ায়—অথচ নিজে খাওয়া বা ধনী বন্ধু-বান্ধবদেরে খাওয়ানো যে সওয়াবের কাজ নয় তা সকলেরই জানা। এ থেকে বুঝা গেল—খাওয়ানো বা খাদ্য বিতরণকে তারা সওয়াবের

কাজ বলে মনে করে না।—নতুবা যাদেরে খাওয়ালে সওয়াব হয় তাদেরেই খাওয়াতো। এ ধরনের বিশ্বাস কোরআন হাদীসের পরিপন্থী ভ্রান্ত বিশ্বাস–যা থেকে তওবা করা ওয়াজিব।

কেউ হয়তো বলতে পারে, নিয়ত করাও তো একটা কাজ। এ কাজের সওয়াব মৃতকে পৌঁছানো অনর্থক হবে না। আমি বলি, মানলাম, নিয়তও একটা কাজ। কিন্তু কথা হচ্ছে, নিয়ত ও খাদ্য খাওয়ানোর সওয়াব সম্পূর্ণ ভিন্ন, আপনি মৃতকে কোনটার সওয়াব পৌঁছাতে চান। তাছাড়া, খাদ্য প্রস্তুতের আগেই তো নিয়তের সওয়াব পেয়ে গিয়েছিলেন, সে সওয়াব তখনই বখশে দিতে পারতেন। আসলে এ রেওয়াজেরও কোন বুদ্ধিভিত্তিক কারণ নেই, এ শুধু প্রথা পালন ছাড়া কিছুই নয়। তবে শরীয়তসম্মত পন্থায় ইছালে সওয়াব করা অত্যন্ত ভাল কাজ। কোন প্রকার প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে না করে, নিজের সামর্থ্যানুযায়ী উপযুক্ত পাত্রে কিছু দান করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেওয়াকে ইসলামী শরীয়ত উৎসাহিত করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার প্রথার হুকুম জানতে পারা যায়। ভ্রান্ত আকীদা বা নিয়ম-কানুনের বশবর্তী না হয়ে বৎসরের যে কোন দিন ইছালে সওয়াব করা নির্ভেজাল জায়েয। অপর পক্ষে মাকরূহ রীতি-প্রথার বশবর্তী হয়ে ইছালে সওয়াব করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে যে সকল নিয়ম-কানুন পালন করলে নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন মুবাহ কাজ গোপনে করার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রেও পালিত নিয়ম-কানুন মাঝে-মধ্যে পরিবর্তন করা উচিত, যাতে করে নিজের বা অন্যের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে না পারে। এতদসত্ত্বেও রীতি-নীতি থেকে মুক্ত হয়ে ইছালে সওয়াব করাই সর্বোত্তম। কেনন, অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন প্রথা, প্রথমে খালিছ নিয়তে শুরু হলেও পরে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যাকে নিষেধ করা ছাড়া মানুষের ভ্রান্তি দূর করার কোন গত্যন্তর থাকে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি, ঈদের দিনে সেমাই ও আশুরার সময় খিচড়ী-শরবতের ব্যবস্থা করাও বর্তমান কালে একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। হাদীসে শবেবরাত সম্পর্কে এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ রাতে হুযূর (সাঃ) আল্লাহ তাআলার হুকুমে জান্নাতুল বাকীতে তশরীফ নিয়ে সেখানকার কবরবাসীদের রূহে মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করেছিলেন। এ হাদীসের উপর আমল করা ছাড়া অন্য সব রীতি-নীতি পালন কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এ সমস্তের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো ঃ—

এক—কোন কোন জাহেল বলে, হুযূর (সাঃ)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হওয়ার পর তিনি হালওয়া শিরনী করেছিলেন। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। একথা বিশ্বাস করা জায়েয হবে না। সাধারণ বিবেচনায়ও তা সম্ভব নয়। কারণ, ওহুদ যুদ্ধ শাবান মাসে নয় বরং শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

দুই—কেউ কেউ বলেন, এইদিনে হযরত আমীর হামযা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাঁরই রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে এই দিন হালুয়া-রুটি বিতরণ করা হয়। এটা একটা অমূলক ধারণা। কেননা, তাঁর শাহাদাতও শাওয়াল মাসে হয়েছিল ; শাবানে নয়।

তিন—অনেক লোকের বিশ্বাস, শবে-বরাত ইত্যাদি পুণ্যময় রজনীসমূহে মৃত আত্মীয়-স্বজনের রূহ ঘরে ঘরে হাজির হয়ে দেখে তাদের জন্য কেউ কোন কিছু রান্না করছে কিনা? বলাবাহুল্য, এ জাতীয় গোপন তত্ত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রীয় অকাট্য দলীল ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর শাস্ত্রে এর কোন দলীল নেই।

চার—অনেকের ধারণা, শবে-বরাতের পূর্বে যার মৃত্যু হয়েছে, শবে-বরাতে ফাতেহা আদায় না করা পর্যন্ত তার রূহ অন্যান্য মৃতদের সাথে মিশতে পারবে না। এ ধারণাও সম্পূর্ণ বানোয়াট।

হাদীসে আছে,—'কারো মৃত্যু হলে তার রূহ সাথে সাথেই তার সমপর্যায়ের লোকদের কাছে পৌঁছে যায়। এটা তো কোথাও নেই যে—'শবে বরাত পর্যন্ত রূহ আটকে থাকে'।

পাঁচ—হালুয়া-রুটি না হলে যেন শবে-বরাতই হলো না। এরাতে হালুয়া প্রস্তুত করাকে অতীব জরুরী মনে করে লোকজন আক্বীদা গত ভ্রান্তিতে পতিত হয়। আর এ প্রথাকে ফরয-ওয়াজিবের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কার্য গত ভ্রান্তির শিকার হয়। এ উভয় প্রকার ভ্রান্তি যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ তা প্রথম অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়াও এ প্রথা পালন করতে গিয়ে নিয়তেও ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞজনের নিশ্চিত বিশ্বাস। বর্তমান কালে সওয়াব লাভের আশায় হালুয়া-রুটি প্রস্তুত করা হয় না, বরং আসলে উদ্দেশ্য থাকে যে, শবে-বরাতে যে করেই হোক তা পালন করতে হবে, নতুবা লোকে মন্দ বলবে। এই নিয়তে খরচ করা অপব্যয় ও অহংকার—তাই তা পাপ। অনেক সময় প্রথা পালনের জন্য সুদে ঋণ নিতেও দেখা যায়—যা একটা স্বতন্ত্র গোনাহ।

ছয়—সাহায্য পাওয়ার যোগ্য লোকজন শবে-বরাতের হালুয়া-রুটি থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা নিম্নমানের শিরনী প্রস্তুত করে তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। আর ভালোগুলো কেবল আত্মীয়-স্বজন ও বড়লোকদের বাসায় আদান-প্রদান করা হয়। এই সময় সকলেরই নিয়ত থাকে যে, 'অমুক আমার বাসায় শিরনী পাঠিয়েছে, আমি যদি তার বাসায় কিছু না পাঠাই তাহলে সে কি মনে করবে? অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রেও রিয়া ও অহংকারের উপস্থিতি সুস্পষ্ট।

সাত—অনেকে এই রাতে মুশুরীর ডাল রান্না করে থাকে। এই প্রথার উৎপত্তির কারণ আজ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি, তবে একে অত্যাবশ্যক মনে করা যে গোনাহের কাজ তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। খাদ্য রান্না করার কুসংস্কার ছাড়াও এ রাতে আতশবাজিও করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসে গেছে।

সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো কিছু লোক শবে-বরাতে সারারাত জেগে থাকার জন্য এত গুরুত্ব সহকারে আত্মীয়-স্বজনদেরে নিজ বাড়ীতে জড়ো করে থাকে যে তাতে ফরয কর্তব্যও গুরুত্বহীন বলে মনে করে। ঘরে বেশী লোকের সমাগম হলে রাত জাগা সহজতর হয় সত্য, তবে নফল ইবাদতের জন্যে এত গুরুত্ব দিয়ে বেশী লোক জমা করা শরীয়তী বিধানের সুস্পষ্ট

লংঘন। একথা বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যা, আমন্ত্রণ ছাড়াই যদি কিছু লোক একস্থানে জড়ো হয়ে যায় তাহলে কিছু আসে যায় না।

আট—কিছু লোক শবে-বরাতের সময় ঘরের বাসন-কুসন পরিবর্তন করা, ঘর লেপা এবং এই রাতে অতিরিক্ত বাতি জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করাকে অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। এ জাতীয় রসূম কাফেরী রীতির অনুরূপ। আর হাদীসে বিজাতীয়দের অনুকরণকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীসে শবে-বরাতের সময় তিনটি কাজ সুন্নত মত করাকে সওয়াব ও বরকত লাভের উপায় বলা হয়েছে। প্রথমতঃ পনর তারিখ রাতে কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা। সাথে সাথে গরীব মিসকীনদেরে কিছু দান করে সে দানের সওয়াবটুকু ঐ মৃতদের নামে বখশে দিলে আরো ভাল হয়। সেই মুহূর্তে হাতে না থাকলে অন্য সময় গোপনে কিছু দান করে দেবে। তবে প্রচলিত প্রথার অনুকরণ করলে শরীয়তের সীমা লংঘিত হবে। দ্বিতীয়তঃ রাত জেগে একা একা বা বিনা আমন্ত্রণে জড়ো হয়ে যাওয়া দু'চার জনের সাথে ইবাদতে মশগুল থাকা। তৃতীয়তঃ শাবানের পনর তারিখ নফল রোজা রাখা।

ঈদুল ফিতিরের দিন সেমাই তৈরী করা মূলতঃ মুবাহ কাজ। কিন্তু সাধারণ লোকেরা এতে নানাপ্রকার কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এক—তারা একে এতই জরুরী মনে করে যে, সেমাই না হলে যেন ঈদটাই মিছে। একটা মুবাহ কাজকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করা যে শরীয়ত বিরোধী কাজ তা আগেই বলা হয়েছে।

দুই—নিজের অর্থ না থাকলে সুদে ঋণ নিয়ে হলেও এ রীতি পালনকরা হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে ঋণ করা শরীয়তে জায়েযনাই

তিন—এই সম্পর্কিত একটি বানোয়াট বর্ণনা সাধারণ্যে প্রচলিত রয়েছে যে, ফাতেমা (রাঃ) আটার সেমাই তৈরী করেছিলেন। এটা একটা অপবাদ ছাড়া কিছু নয়। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ জাতীয় কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

চার—আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ পরস্পরের বাড়ীতে ঈদের সেমাই প্রেরণ করে থাকেন। গ্রহীতাগণ এ দানকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে সাথে সাথেই বা পরবর্তী ঈদে তা পরিশোধ করে থাকেন। এমতাবস্থায় তুলনামূলক ভাবে সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল বন্ধুর বাড়ীতে ঈদের সেমাই পাঠিয়ে তাকে ঋণগ্রস্থ হতে বাধ্য করেন। কেননা, এদান পরিশোধ করা সমাজের অলংঘনীয় নিয়ম। ঈদের দিন হুযুর (সাঃ) কিছু পরিমাণ খুরমা সাথে করে ঈদগাহে নিয়ে যেতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে দুধ সেমাই ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে তা যেন প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে না হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলে অযথা সংকোচ বোধ করা উচিত নয়। এবং স্বচ্ছল অবস্থায় প্রথা পালন না করে বরং নিজের সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

দশই মুহররম সম্পর্কে হাদীসে যে দুইটি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলো, এক—নয় ও দশই মুহররম রোযা রাখা এবং দুই—দশ তারিখ পারিবারিক প্রয়োজনে সামর্থ্যানুযায়ী বেশী করে ব্যয় করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে আছে যে এই কাজ করলে সারা বছর আয়-রোজগারে বরকত হয়। এই দুই কাজ ছাড়া অন্য সব কিছু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ প্রথাসমূহের বর্ণনা নীচে প্রদত্ত হলো,—

এক—তাজিয়া প্রস্তুত করা। অনেক প্রকার ফাসেকী ও মুশরেকী চিন্তাধারার ফসল এ তাজিয়া—নাঊযুবিল্লাহ, এতে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) সমাসীন হয়ে থাকেন বলে কোন কোন জাহেলের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা তাজিয়া পাদদেশে নযর-নিয়াজ দিয়ে থাকে। গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করার দরুন এসব নযর-নিয়াজ খাওয়া হারাম। তাজিয়ার সামনে হাত জোড় করে বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়ানো, এর দিকে পশ্চাৎ না ফিরানো, এতে বিভিন্ন প্রতীক ও ব্যানার টাঙ্গানো, একে দেখতে যাওয়াকে যিয়ারত বলে অভিহিত করা ইত্যাদি আরো নানাধরনের শিরকী ব্যবহার করা হয় এ তাজিয়ার সাথে। তাজিয়ার সাথে জাহেলদের এ ব্যবহার করা কোরআন শরীফের আয়াত—"তোমরা কি নিজেদের গড়া বস্তুর পূজা কর"—এর বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। একদিন যে তাজিয়াকে সীমাতিরিক্ত সম্মান করা হয়,

তাকেই আবার একদিন অবর্ণনীয় অবহেলা ভরে জনহীন প্রান্তরে ফেলে দেওয়া হয়—এর রহস্য কি? সত্যিই, শরীয়ত যাকে অন্যায় মনে করে তা বুদ্ধিরও পরিপন্থী। কোন কোন অপদার্থ বলে, হযরত হুসাইনের (রাঃ) সাথে এই তাজিয়ার সম্পর্কে সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই তো এটা সম্মান পাবার যোগ্য। এর জবাবে বলবো, হযরত হুসাইনের সাথে যা সম্পর্কিত তাকে সম্মান করা তো খারাপ কিছু নয়, কিন্তু সম্পর্কটা বাস্তবিক হতে হবে অবশ্যই। যেমন, হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর পোশাক-আশাক ইত্যাদি আমাদের কাছেও সম্মানের। মনগড়া সম্পর্ক সৃষ্টি করলে সেটা কোন মতেই সম্মানযোগ্য হবে না। নতুবা, ভবিষ্যতে কেউ স্বয়ং হুসাইন (রাঃ) হওয়ার দাবী করলে তাকে আরো বেশী সম্মান করতে হবে। অথচ, হুসাইন হওয়ার মিথ্যা দাবীদারকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলতে কেউ ছাড়বে না—এটা সুনিশ্চিত। অতএব, বুঝা গেল মিথ্যা সম্পর্কের দরুন কোন বস্তু সম্মানার্হ হতে পারে না বরং আরো অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়। এখন আপনারাই বিবেচনা করুন, তাজিয়া সম্মানিত হবার যোগ্য না অপমানিত হবার যোগ্য।

দুই—ঢাক-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো। হাদীসে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাজ একদিকে যেমন শরীয়ত বিরোধী অপরদিকে তেমনি বিবেকেরও পরিপন্থী। এ বাদ্যযন্ত্রগুলি তো আসলে আনন্দ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়, শোকাহত অবস্থায় এগুলি বাজিয়ে কি প্রকৃতপক্ষে উল্লাস করা হয় না?

তিন—ফাসিক-ফাজিরগণ সম্মিলিত হয়ে অবর্ণনীয় কুকীর্তির সূত্রপাত ঘটায়।

চার—আশুরার দিনে আহাজারী করা বা জারী পেটানো। একে হাদীসে কঠোরভাবে তিরস্কৃত করা হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়ায়াতে আবু দাউদে বর্ণিত আছে—'হুযূর (সাঃ) আহাজারীকারী ও তা শ্রবণকারীর উপর লানত করেছেন।'

পাঁচ—মর্সিয়া (শোকগাঁথা) পাঠ। ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, 'রসূলুল্লাহ (সাঃ) মর্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন।'

ছয়—আশুরা উপলক্ষে বানোয়াট হাদীস বর্ণনার হিড়িক পড়ে। একে

হাদীসে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সাত—আশুরা পালন উপলক্ষে সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকাকে 'শোক' বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে শোক পালন সম্পর্কে বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী চার মাস দশদিন এবং বিধবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক পালন করবে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অতএব চৌদ্দশ' বছর পর এখন সে শোক পালন নিঃসন্দেহে হারাম হবে।

আট—আশুরা উপলক্ষে বিশেষ ধরনের বা রঙেড়র পোশাক পরে শোক প্রকাশ করা ইবনে মাজায় হযরত ইমরান ইবনে হোসাইনের (রাঃ) বরাত দিয়ে এই মর্মে এক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা এক জানাযায় গিয়ে দেখলেন সেখানে উপস্থিত লোকজন শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে চাদর ছেড়ে জামা গায়ে দিয়ে এসেছে, ঐ অঞ্চলে এই ভাবে শোক প্রকাশের রীতি প্রচলিত ছিল। হুযূর (সাঃ) তাদের এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা কি জাহেলী কাজ শুরু করেছ! না কি জাহেলী প্রথার অনুকরণ করছো? আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তোমাদের উপর এমন বদদোয়া করি যেন তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। একথা বলার সাথে সাথে সবাই নিজ নিজ চাদর খুলে ফেলেন এবং এরপর আর কোনদিন একাজ করেননি। উপরোক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ধরণের বেশ ধারণ করা হারাম।

নয়—কোন কোন লোক আপন বাচ্চাদেরে ইমাম হুসাইনের (রাঃ) ভিক্ষুক বানিয়ে ভিক্ষা করিয়ে থাকে। একাজ করলে বাচ্চা দীর্ঘায়ু হবে বলে বিশ্বাস করা একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আক্বীদা—যা সুস্পষ্ট শিরক। তাছাড়া একান্ত বাধ্য না হয়ে ভিক্ষা করাও হারাম।

দশ—মহররম উৎসব পালন করে সমাজে নবী-বংশের মানমর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। বিশ্বাস ঘাতকদের দ্বারা কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাগণ লাঞ্ছিতা হলে—তা প্রচার করে বেড়ানো সেই বংশের পুরুষদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। অথচ বড়ই আফসোসের বিষয় যে, আশুরার দিনে নবী-বংশের অবস্থা প্রচার করতে তাদের লজ্জায় মোটেও বাঁধে না বরং আরো অনেক ধরণের

ঘৃণিত কাজে মত্ত হয়ে তারা আনন্দ অনুভব করে। যে সকল বৈঠকে এধরণের মানহানিকর বক্তব্য রাখা হয় সে সকল বৈঠকে অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান করা হারাম। 'চেহলাম' নামক প্রথা পালন করতে গিয়েও উপরোক্ত কু-রীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়।

কোন কোন বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো মূলতঃ মুবাহ বা জায়েয হলেও আক্বীদাগত ও কার্যগত বিভ্রান্তি সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সেগুলো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন—

এক—খিচুড়ী ইত্যাদি রান্না করে আত্মীয়-বান্ধব ও গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তার সওয়াব ইমাম হুসাইন (রাঃ)-কে বখশে দেওয়া। —'এ দিনে যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য মুক্ত হস্তে খরচ করবে, আল্লাহ তাআলা সারা বৎসর তার আয়-রোজগারে বরকত দেবেন'—এই মর্মে বর্ণিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যায় আশুরা উপলক্ষে খিচুড়ী বা অন্যান্য খাদ্য-বস্তু প্রস্তুত ও বিতরণে কোন দোষ নেই।

দুররে মুখতারে বলা হয়েছে—'একই কাজ থেকে বিভিন্ন ধরণের সেবাগ্রহণ করলে সে আমলের কোন ক্ষতি হয় না।' যেমন—খিচুড়ী রান্না করে তা আত্মীয়-স্বজনকে দিলেন গরীব মিসকীনকেও দিলেন আবার তার সওয়াব ইমাম হুসাইন (রাঃ)কেও পৌঁছিয়ে দিলেন—এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ একে বিভিন্ন কুসংস্কারের সাথে জড়িয়ে ফেলছে বিধায় কুপ্রথা অনুসারে তা পালন করা নিষিদ্ধ। তবে প্রথা পালন না করে কেউ যদি এমনিতেই একাজ করে তাহলে কোন বাধা নেই।

দুই—শরবত পান করানোও মূলতঃ মুবাহ কাজ। কেননা, পানি পান করালেই যখন সওয়াব মিলে, শরবত পান করালে মিলবে না কেন? কিন্তু, এক্ষেত্রেও রসূমের—দাসত্ব। এ প্রথার তৃতীয় একটি অন্তর্নিহিত দোষ হলো, লোকে মনে করে, কারবালার শহীদগণ যেহেতু পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন, কাজেই তাদের সেই পিপাসা নিবারণের জন্য শরবত পান করানো উচিত। এই কারণেই তারা শরবত পান করায় এবং বিশ্বাস করে যে, এতেই কারবালার শহীদানের তৃষ্ণার উপশম ঘটবে। এজাতীয় বিশ্বাস যে [illegible] ও কোরআন মজীদের শিক্ষার পরিপন্থী তা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত

হয়েছে। যদি বলেন, পান করানোর সওয়াব পৌঁছে থাকে, তাহলে বলবো, শুধু যে শরবত পান করানোর সওয়াবই তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে তা কিভাবে বুঝলেন। অন্যান্য সওয়াবও তো একই রকম—অন্য কাজের সওয়াবে তৃষ্ণা নিবারিত হবে না কেন? তাছাড়া, তাদের বিশ্বাস মোতাবেক মনে হয় যেন কারবালার শহীদগণ আজ পর্যন্ত পিপাসার্তই রয়ে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) কত বড় অশালীন বিশ্বাস ও কাজ। এ জাতীয় ভ্রান্তির দোষেই এই কাজ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

তিন—সহীহ রেওয়ায়েতসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে শাহাদাতে কারবালার ঘটনা বর্ণনা করা মূলতঃ জায়েয ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত অশুভ কারণসমূহের দরুন তা নাজায়েয হয়ে গেছে। (যেমন—(এক)—হাহুতাশ করা, শোক উদ্রেক করা ও আহাজারী করার উদ্দেশ্য নিয়েই কারবালার ঘটনা বর্ণনা করা হয়। অথচ তা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। কেননা, সহানুভূতি প্রকাশ ও শোক-দুঃখে ধৈর্য ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যেই শরীয়ত শাহাদাতের বর্ণনা সম্বলিত বক্তব্যকে জায়েয রেখেছে। শরীয়তের বিরোধীতা করা জঘন্য অপরাধ ও হারাম। এই কারণেই স্বেচ্ছায় স্মরণ করে আহাজারী করা জায়েয নয়, তবে শোকে মুহ্যমান হয়ে চোখে অশ্রু আসলে তাতে গোনাহ হবে না। (দুই) আহাজারী করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শরীয়ত বিরোধী কাজের জমায়েত আহ্বান করাও নিষিদ্ধ। (তিন) এতে করে রাফেজীদের অনুকরণ করা হয়। কাজেই এ জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠান করা বা এতে যোগদান করা উভয়ই নিষিদ্ধ। মুতালিবুল-মুমিনীন কিতাবে একে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শরীয়তের নীতিমালা থেকেও এর পক্ষ সায় পাওয়া যায়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কাহারো মৃত্যুর পর যে সমস্ত প্রথা পালন করা হয় সেগুলোও কুসংস্কারের পর্যায়ভুক্ত। প্রথমতঃ মুর্দার কোন নিকটাত্মীয় জানাযায় শরীক হতে পারবে বা জুমার সময় বেশী করে লোক জমায়েত হলে তখন জানাযার

নামায পড়া উত্তম হবে ইত্যাদি চিন্তা করে অনেক সময় কাফন দাফন ও জানাযার নামায অনুষ্ঠানে বিলম্ব করা হয়। একাজ সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—'জানাযায় কখনও দেরী করবে না।' ফেকাহবিদগণ কোন কোন ওয়াক্তিয়া নামায থেকেও জানাযার কাজকে অগ্রগণ্য বলেছেন। কান্নাকাটি করার জন্য কাফন–দাফন বা জানাযার নামাযে দেরী করা তো আরো খারাপ।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন অঞ্চলে লাশের সাথে টাকা ও তরি–তরকারী নিয়ে গিয়ে কবরের নিকট দান করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। একাজ নিশ্চিত রূপেই সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, তাই শরীয়তের পরিপন্থী। দাফনের সময় কবর–পার্শ্বে সমবেত লোকজনের মধ্যে অধিকাংশই খয়রাত গ্রহণের অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ থাকেন। কাজেই, দান করার ইচ্ছা থাকলে বাড়ীতে গোপনে গরীব–মিসকিনদেরে দিয়ে দিবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সে দানকৃত বস্তু যেন মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল না হয়।

তৃতীয়তঃ কাফনের কাপড়ের সাথে জায়নামাযও লাশের উপরে দেওয়ার চাদরও মৃতের পরিত্যক্ত অর্থ দিয়ে কেনা হয়। জায়নামায ও চাদর যেহেতু সুন্নাত কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেহেতু মৃতের সম্পদ থেকে এগুলোর ক্রয়মূল্য আদায় করা নাজায়েয। তাছাড়া, মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পদে সকল উত্তরাধিকারীর হক্ক রয়েছে এবং হয়তো কোন কোন উত্তরাধিকারী তখনো নাবালেগ অথবা তদস্থলে অনুপস্থিত—এমতাবস্থায় একব্যক্তির পক্ষে মৃতের সম্পদ অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয হবে না। একে তো এগুলির কোন প্রয়োজন নেই ; বরং মাঝে মধ্যে তা পরিহার না করলে অনাবশ্যককে আবশ্যক করা হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে নয় বরং কোন সাময়িক প্রয়োজনে জায়নামায ও চাদর ব্যবহার করার ইচ্ছা থাকলে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত অর্থের বিনিময়ে সেগুলো খরিদ করে দিলে, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে মেয়েলোকের লাশ পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা জরুরী বিধায় সেক্ষেত্রে মৃত মহিলার পরিত্যাক্ত অর্থ দিয়ে পর্দা ক্রয় করা জায়েয হবে।

চতুর্থতঃ কারো মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাপড়–চোপড় অভাবগ্রস্থদেরে দিয়ে দেওয়ার রুসূম রয়েছে। তৃতীয় রুসূমের আলোচনায় বর্ণিত দোষসমূহ এক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। পরিত্যাক্ত সম্পদ ভাগ–বাটোয়ারা না হওয়া পর্যন্ত এধরনের খরচ জায়েয নয়। তবে সকল উত্তরাধিকারীগণ যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হন এবং তারা সবাই উপস্থিত হয়ে একমত হয়ে মৃতের কাপড়–চোপড় বিলিয়ে দেন, তাহলে সম্পদ ভাগ–বাটোয়ারা করার আগেই তা জায়েয হবে।

পঞ্চমতঃ প্রায়ই দেখা যায়, মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে মৃতের বাড়ীতে বা মহল্লার মসজিদে আত্মীয়–স্বজন ও গরীব মিসকীন সমবেত হয়ে কোরআন মজীদ ও কালিমা তাইয়িব খতম করে এর সওয়াব মৃতকে বখশে দেওয়া হয়। খতমের বৈঠক শেষ করবার আগে পাঠকদের যে কোন একজন কয়েকটি রুকু ও কয়েকটি নির্দিষ্ট সূরা উচ্চস্বরে পাঠ করেন। একে 'পাঞ্জ আয়াত' বলা হয়। অতঃপর মোনাজাতের মাধ্যমে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপরে বর্ণিত কাজগুলো বাহ্যত অত্যন্ত শোভনীয় মনে হলেও এর অন্তর্নিহীত দিকগুলোর উপর সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি।

অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, এ বৈঠকে আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু–বান্ধবদের উপস্থিতি কেবল দোষ ছাড়ানোর উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে। তাদের আগমনের পেছনে ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্য খুবই বিরল।এমনকি কোন আত্মীয় যদি নিজের ঘরে বসে পুরা কোরআন মজীদ খতম করে মৃতকে বখশে দেয় তবুও এ বৈঠকে উপস্থিত না হলে মৃতের পরিবারবর্গ অসন্তুষ্ট হন। তাইতো দোষস্খলনের উদ্দেশ্যে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ পর যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়লেও তারা অসন্তুষ্ট হননা। বার বার বলা হয়েছে, এ ধরনের ভ্রান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজ করলে তাতে সওয়াব হবে না। আর সওয়াবই যখন পাওয়া গেল না, মৃতকে কি দেবেন? বাকী রইল, মিসকীনদের ব্যাপার। তারা যদি একথা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারে যে, সেখানে গিয়ে কেবল পড়তেই হবে, খাওয়া–দাওয়া বা অর্থ–কড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে নেই—তাহলে তারা কেউ সে বৈঠকে উপস্থিত হবে না। অতএব, বুঝা গেল, তারা শুধু কিছু পাওয়ার

লোভেই এসে থাকে। দুনিয়াবী বিনিময় হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন আমল করলে তা যে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলো না তা বলাই বাহুল্য। কাজেই এ আমলে সওয়াব হবে না! আর সওয়াব না হলে মুর্দাকে কি দেবেন?

মোট কথা, তাদের সমস্ত প্রয়াস ও অর্থ জলে নিক্ষিপ্ত হলো। অধিকন্তু কোরআন খানিকে আয়-রোজগারের একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করার গোনাহ তো হবেই। কোরআন শরীফ পড়ার পারিশ্রমিক গ্রহণ ও দান উভয়ই নাজায়েয। এই সূত্রে পারিশ্রমিক হিসাবে বিতরণকৃত অর্থ ও খাদ্যের বিতরণকারীও গোনাহ থেকে রেহাই পাবেন না। তাছাড়া কোরআন খানিকে অত্যাবশ্যক মনে করা বা প্রথার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোন দিনে তা পালন করা মাকরূহ। কোন কোন এলাকায় কোরআন খানিতে ফুল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়—একাজ কাফেরদের অনুকরণ। তেমনিভাবে 'পাঞ্জ আয়াত' পাঠ কালে পাঠকগণের মনে আপন কেরাআত শুনানোর ইচ্ছা জাগ্রত হয়—যাতে রিয়ার পাপ অতি সহজেই প্রবেশ করে। উপরন্তু 'পাঞ্জ আয়াত' পাঠকে অত্যাবশ্যক মনে করা বা এর জন্য কোন রুকু-আয়াত নির্দিষ্ট করা স্বতন্ত্র গোনাহ।

ষষ্ঠতঃ কোন কোন নির্দিষ্ট দিনে বা তার সামান্য আগে-পরে খাদবস্তু রান্না করে বন্ধু-বান্ধব ও গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে এর সওয়াব মুর্দাকে পৌছে দেওয়ার রেওয়াজ প্রায় সকল এলাকায়ই রয়েছে। এখানেও রিয়া ও অহমিকা প্রকাশের গোনাহ হয়। এই রসূম পালনে এতই গুরুত্ব প্রদান করা হয় যে কোন সময় ঋণ গ্রহণ করেও তা আদায় করা হয়। কাউকে যদি বলা হয়, খাদ্য প্রস্তুত করতে যে টাকা খরচ হবে সেই পরিমাণ টাকা গোপনে দান করে দেন, তাহলে এ প্রস্তাব তার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না। বরং মনে মনে চিন্তা করবে, এত টাকা খরচ করবো অথচ কেউ তা জানবে না, এ হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারী-গণের সম্মিলিত সম্পদ থেকে এ বাবদ খরচ করা হয়, যার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া, খয়রাত পাবার অনুপযুক্ত বন্ধু-বান্ধবকে দান করে সম্পদ বিনষ্ট করা হয়। কোরআ-হাদীসে এর উপর

নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে। এতসব দোষ-ত্রুটির সমাহার ঘটায় খাদ্য বিতরণ অবশ্য পরিহার্য বলে বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক।

কেউ কেউ হয়তো জানতে চাইবেন, তাহলে ইসালে সওয়াব কিভাবে করা যাবে? উত্তরে বলবো, 'যেভাবে পূর্ববর্তী নেককার উলামায়ে কেরাম করে গেছেন সেই ভাবে করবেন।' শর্তহীন ও অনির্দিষ্ট ভাবে, আপন সামর্থ্য অনুযায়ী, হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে, গোপনে গরীব মিসকীনদেরে সাহায্য করে মৃতের রূহকে সওয়াব দান করুন। নিজে যতটুকু পারেন কোরআন ইত্যাদি খতম করে তার সওয়াব মৃতকে বখশে দিন। অথবা, দাফনের পর কবরস্থানে অযথা সময় নষ্ট না করে বরং ঐ সময়টুকু কোরআন তেলাওয়াত করে তার সওয়াবটুকু মুর্দাকে দান করুন। এই সময় মুর্দার জন্য দোয়া কবুল হওয়ার অত্যন্ত উপযোগী।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হুযূরে আকরাম (সাঃ) হযরত সাদ ইবনে মুয়াযের (রাঃ) দাফন কার্য সম্পন্ন করে কিছু তসবীহ তাহলীং পাঠ করেছিলেন, যার বদৌলতে হযরত সাদের কবর সংকোচিত হয়নি। আসল কথা হলো, ইসালে সওয়াব নিষিদ্ধ কাজ নয় বরং ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত ও অনর্থক কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে, যেগুলোতে কেবল অর্থের অপচয় ঘটে ; কোন সওয়াব লাভ হয় না।

সপ্তমতঃ মহিলাগণ বার বার মৃতের ঘরে গিয়ে পান-সুপারী ও খাদ্যাদি পানাহার করে থাকে। এক্ষেত্রেও কয়েকটি মাকরূহ বিষয়ের সমাহার ঘটে। প্রথমতঃ দুররে মুখতার কিতাবে বার বার সহানুভূতি জ্ঞাপন করাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। বিবেকও তো বলে, দুঃখের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া একটা অবিবেচক সুলভ আচরণ। সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে তা বিস্মৃত করার চেষ্টা চালানো; বিস্মৃত দুঃখকে পুনঃস্মরণ করিয়ে দেওয়া নয়। তদুপরি, সহানুভূতি প্রকাশ বলতে যা বুঝায়, অর্থাৎ, মৃতের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেওয়া, তাদেরে সবর করার অনুপ্রেরণা দান করা ইত্যাদির তো কোন পাত্তাই থাকে না, এমনকি এ প্রসঙ্গে কোন কথা উচ্চারিত হতে শুনা যায় না অনেকের মুখে। মৃতের বাড়ীর পান চিবুতে চিবুতে তারা আপন মনে নিজদের সুবিধা-অসুবিধার

কথাই পাড়তে থাকেন। কেউ যদি জিজ্ঞাসু হয়ে বলেন, 'আপনারা কিজন্য তশরীফ এনেছেন? জবাবে তারা হয়তো বলবেন, 'এই তো দোষ ছাড়ানোর জন্যই এসেছি।' আর যাদের একটু বেশী দরদ রয়েছে, তারা সবরের উপদেশ দানের বিপরীতে মৃতের আত্মীয়-স্বজনের গলায় ধরে কান্না জুড়ে দেন। এতে করে মৃতের প্রতি তার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা প্রকাশ পায়। এতে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করার গোনাহ তো আছেই, উপরোক্ত তা বিবেকেরও পরিপন্থী। মুর্দার পরিবারের সদস্যগণের মনে সান্ত্বনা প্রদান করাই সমদুঃখী হওয়ার উদ্দেশ্য তাদের মনে হাহুতাশ আরো বাড়িয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। মোট কথা, এভাবেও সহানুভূতি প্রকাশ হয় না। কাজেই মহিলাদের আগমন নিস্ফল কাজ। মহিলাদের সমাবেশে যে আরো অনেক ধরণের অপকারিতা নিহিত রয়েছে তা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অন্য বাড়ীতে মৃতের ঘরে এসে মেহমানদারী করা, তাদের পান-চুন ব্যবহার করা বা খাদ্য খাওয়া স্বয়ং নিন্দনীয় কাজ। ফেকাহর কিতাবসমূহে একথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুররে মুখতার গ্রন্থের 'কিতাবুল ওসিয়্যাত' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, দূর-দূরান্ত থেকে সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে আগত মেহমানদের পক্ষে মৃতের বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ ও সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। মোট কথা, মুর্দার পরিবারের উপর চেপে গিয়ে তাদেরে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ শরীয়তে বিরোধী এবং নেহায়েত অসহানুভূতি পূর্ণ কাজ। আমাদের অত্রাঞ্চলে অনেকদিন পর্যন্ত মৃতের বাড়ীতে মেহমানগণ আসতে থাকেন আর বাড়ীর সদস্যগণ দানা-দানি জোগিয়ে সেই মেহমানদের সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে একেবারে অতিষ্ট হয়ে উঠেন। হাদীসে মেযবানকে অতিষ্ট করাকে সম্পূর্ণ হারাম বলা হয়েছে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার উপর মেহমানদের উপদ্রব সারতে না সারতেই ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় আবার সেই মেহমানের বাহিনী এসে চড়াও হয়। যেন ইদ্দত কোন সংকীর্ণ কুঠির ; যা থেকে বিধবাকে হা-পা বেঁধে টেনেটুনে বের করতে অনেক লোকের প্রয়োজন। (নাউযুবিল্লাহ)

তৃতীয় একটা দোষণীয় দিক হলো, দূরের ও কাছের সমস্ত মেহমানদের খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় ব্যয় মৃতের মোট পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে করা হয়—যা সুস্পষ্ট অনাচার ও পরধন আত্মসাতের শামিল। আতিথেয়তা করার ইচ্ছা থাকলে নিজস্ব সম্পদ খরচ করা উচিত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ছাড়া অপরের অংশ থেকে ব্যয় করা সম্পূর্ণ হারাম। 'কেবল আমার অংশে আতিথেয়তা ব্যয় পোষাবে না' বলে অজুহাত পেশ করাও এক ধরনের বোকামী। পূরা পরিত্যাক্ত মালেও সে ব্যয় না পোষালে কি পাড়া প্রতিবেশীর মাল চুরি করা হালাল হয়ে যাবে? বুঝা গেল, মেহমানের দল এই গোনাহে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। অতএব, নিকটে অবস্থানকারী নারী-পুরুষের উচিত মৃতের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে অতিসত্বর চলে আসা। অতঃপর দ্বিতীয়বার আসার বা কোরআন খানির তারিখ নির্দিষ্ট করার কোন দরকার নেই। বরং সুযোগ মত একবার তা করে নেওয়া যাবে। আর দূরের আত্মীয়গণ যদি মনে করেন যে, তাহলে এই উদ্দেশ্যে আগমন করা দোষণীয় নয়। নতুবা, চিঠি মারফত সমবেদনা জ্ঞাপন করলেও সুন্নত আদায় হবে। হযরত মুআয ইবনে জাবালের (রাঃ) ছেলে মারা গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে পত্র মারফত সমবেদনা জানিয়েছিলেন।

অষ্টমতঃ প্রথমদিন মৃতের বাড়ীতে কোন নিকটাত্মীয়ের বাড়ী থেকে খাদ্য প্রেরণ করার রীতি রয়েছে। এ রীতি মূলতঃ জায়েযই নয় বরং সুন্নত এবং বিবেকের তাকিদও বটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন:কার দোষ-ত্রুটি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো সংশোধন করা একান্ত কর্তব্য। প্রথমতঃ এতে অদল-বদল করার মানসিকতা থাকে। যেমন, অমুক আমার শোকের সময় খাদ্য পাঠিয়েছিলেন, তার শোকে আমাকেও খাদ্য পাঠাতে হবে। এটা কোন ব্যবসা নয় ; বরং শোকাহতদেরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। পরিশোধের ইচ্ছায় অনেকে ঋণ করতেও দ্বিধান্বিত হন না। এটা একটা শিষ্টাচার ; আর শিষ্টাচারের করা হারাম। কেউ যদি কেবল প্রথার কারণে এ শিষ্টাচার পালন করাকে অত্যাবশ্যক মনে করে, তাহলেও তো তাকে পরোক্ষ ভাবে বাধ্য করা নিঃসন্দেহে মাকরূহ। একাজ আড়ম্বরহীন ও সহজ-সরল ভাবে আদায় করা উচিত। এতে দান পরিশোধ বা সম্পর্কের ক্রমধারা বিবেচ্য বিষয় নয় যে, নিকটাত্মীয়

না দেওয়া পর্যন্ত দূরাত্মীয় দিতে পারবে না ; বরং যারই সামর্থ্য আছে সে-ই দিতে পারে। নিকটাত্মীয় কর্তৃক দূরাত্মীয়কে বাধা দান করা এবং বেঁচে-মরে ঋণ করে হলেও তা আদায় করা কেবল বদনামী থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মৃতের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র দু চারজন হলেও বহুদূরের আত্মীয়কেও এ সময় পরিবারের সদস্য ধরে নিয়ে খাদ্য প্রেরণ করা হয়—যা শরীয়তের সীমার সুস্পষ্ট লংঘন। মৃতের পরিবারের সদস্যগণ শোকাহত অবস্থায় খাদ্যাদি রান্না করতে পারবে না বলেই তাদের জন্য খাদ্য প্রেরণ করা হয় ; এজন্য সারা বাড়ীতেই যে চুলায় আগুন জ্বলবে না এমন তো নয়। পরিবারের সদস্যগণ ছাড়া অন্যদের পক্ষে এ খাদ্য খাওয়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি তাদের জন্য রান্না করাও নাজায়েয। অতএব, বিরাট আয়োজন না করে মোটামুটি চলনসই খাদ্য প্রেরণ করা উচিত।

নবমতঃ কোন কোন এলাকায় দশদিন পর্যন্ত আবার কোন কোন এলাকায় চল্লিশ দিন বা তার চেয়ে সামান্য অল্প বেশী দিন পর্যন্ত হাকিম সাহেবদের দিয়ে কবরগাহে বা নিজ গৃহে কোরআন পাঠ করানোর রেওয়াজ রয়েছে অতঃপর সেই হাকিম সাহেবগণকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। অনেকেই একাজকে জায়েয বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত। ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয নয় ; আর এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য পারিশ্রমিক প্রদান ও গ্রহণ, কাজেই একাজ কোনমতেই বৈধ হবে না। এভাবে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না। সওয়াব না পেলে মৃতকে কি দেবেন?

অনেকে সন্দেহে পড়ে গেছেন যে, উলামায়ে মুতাআখখিরীন শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের তাকিদে কোরআন শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। প্রশ্নের মধ্যেই এ সন্দেহের জবাব রয়েছে। অর্থাৎ, সেখানে কোরআনের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকায় প্রয়োজনের তাকিদেই পারিশ্রমিক গ্রহণকে জায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবার কোন আশংকা নেই। তবে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী কোরআন তেলাওয়াত করে মৃত বন্ধু-বান্ধবকে বখশে দেওয়া অত্যন্ত ফলদায়ক। কোন কোন এলাকায় জানাযার নামায পড়িয়ে এবং কবর যিয়ারত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার

মতো ঘৃণ্য রীতিও প্রচলিত রয়েছে। এ পারিশ্রমিক গ্রহণ নিঃসন্দেহে হারাম।

দশমতঃ মৃতের পরিবার অনেকদিন পর্যন্ত শোক পালন করে থাকে। শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লংঘন করে শোক পালন হারাম।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রমযান শরীফে পালিত কোন কোন প্রথাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এসব রীতি প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমতঃ হাফিযগণ সাধারণতঃ নিজের কোরআন-পাঠ শেষ করে অন্য হাফিযের তেলাওয়াত শুনতে যান। কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা বা তার উদ্দেশ্যে কোথাও গমন করা তো ভালো কাজ। কিন্তু, অন্য হাফিযের ত্রুটি আবিষ্কার করে তার প্রচার করে বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ হাফিযগণ অন্যের তেলাওয়াত শ্রবণ করতে গিয়ে থাকেন। কোন মুসলমানের দোষ-চর্চা করা হারাম। কোরআন-হাদীসে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কোন মুসলমানকে অপদস্থ করা পৃথক গোনাহ। আর গোনাহের ইচ্ছা নিয়ে রওয়ানা হওয়া বা কোথাও উপস্থিত হওয়াও গোনাহর কাজ। তবে, কোরআনের বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন সুমিষ্ট তেলাওয়াত শুনে প্রফুল্লচিত্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোথাও গমন করা দোষণীয় নয়। এক্ষেত্থেও প্রথম উদ্দেশ্য ইবাদতের প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মুবাহ। কোন কোন হাফিয অভ্যাস অনুযায়ী শব্দ করে বা লণ্ঠন নেড়ে নিজের আগমনী বার্তা জানিয়ে দেন, ফলে তেলাওয়াতকারী হাফিয সন্ত্রস্ত হয়ে ভুল করে বসেন। কোন ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি করা শয়তানী কাজ। কোন কোন হাফিয নামাযে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা করে ভুল কেরাআত শুরু করে দেন ; এভাবে মুক্তাদি-হাফিযের স্মরণশক্তিকে পরীক্ষা করেন। এ সমস্ত গোনাহের কাজ। তেলাওয়াত শ্রবণ করার ইচ্ছা থাকলে চুপে চুপে গিয়ে এক জায়গায় বসে থাকবে ; তবে নামাযে শরীক হয়ে তেলাওয়াত শুনাই উত্তম। শ্রবণের ইচ্ছা পুরা হয়ে গেলে সেখান থেকে চুপে চুপে চলে আসা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন হাফিয তাড়াতাড়ি বা কয়েকবার কোরআন খতম করাকে সুনামের কাজ বলে মনে করেন। এজন্যে তারা এত দ্রুততার সাথে তেলাওয়াত করেন যে হরফগুলোই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। কোরআন মজীদে তারতীল করাকে ফরয বলা হয়েছে। ইলমে তাজবীদ অনুসারে কোরআন পাঠ করাকে তারতীল বলা হয়। এ ফরয ছাড়লে গোনাহ হবে। বিশেষ করে যখন কোন দেখানো ও আত্মগর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে তারতীল পরিত্যাগ করা হয় তখন আরো বেশী গোনাহ হবে। কোন কোন হাফিয এত লম্বা কেরাআত পড়েন যে মুক্তাদীগণ ভয়ে পেয়ে যান। হাদীসে ইমামকে হালকা নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লম্বা কেরাআত পড়ে এ হুকুম লংঘন করা হয় বিধায় এটা মন্দ কাজ। মোট কথা, মুক্তাদীগণের সহ্যসীমার অতিরিক্ত পরিমাণ পড়া ঠিক নয় এবং কয়েক খতম করার কোন প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়তঃ কোন কোন হাফিযের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে কোরআন শুনানোর অভ্যাস রয়েছে। ইবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। পারিশ্রমিক প্রদান করাও হারাম। কেউ কেউ বলে, আমরা প্রথমে নির্ধারিত করে নেইনি কাজেই তা পারিশ্রমিক হবে না। জবাবে বলবো, প্রথমে নির্ধারণ না করলে কি হবে ; উভয়ের নিয়ত তো এটাই। আর সে অব্যক্ত নিয়ত কোন সম্ভাবনা বা আশংকার পর্যায়ভুক্ত নয় বরং একেবারে নিশ্চিতই। হাফিয সাহেব যদি ঘুনাক্ষরে এ কথা জানতে পারেন যে এখানে টাকা মিলবে না তাহলে এখানে পড়াবেনই না। ফেকাহ শাস্ত্রের সর্বজনবিদিত নীতি হলো, প্রচলিত নিয়ম আরোপিত শর্তের অনুরূপ।' এ নিয়ম যখন চালু হয়ে গেছে এবং দাতা গ্রহীতার নিয়তও যখন একই—তখন নিঃসন্দেহের বিনিময় হবে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে কোরআন শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ সংক্রান্ত সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হুযূর, বিনা পারিশ্রমিকে কোন হাফিয সাহেব তো পাইনা ; পারিশ্রমিক দিয়ে কোরআন শ্রবণ করা নাজায়েয হলে আমরা কিভাবে তা শুনতে পারি? এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো, সারা কোরআন শরীফ শ্রবণ করা তো ফরয নয় বরং মুস্তাহাব। আর মুস্তাহাব আদায় করতে গিয়ে হারাম ঘাড়ে লওয়া কখনও জায়েয হবে

না। সূরা ফিল থেকে শুরু করে তারাবীহ আদায় করে ফেলুন। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কোরআন শরীফ খতম করা জরুরী নয়।

চতুর্থতঃ কোন কোন হাফিযের এ অভ্যাসও রয়েছে যে, শবে কদর বা অন্য কোন রাতে সারা রাত জাগ্রত থেকে একা একা বা কয়েক জন মিলে কোরআন শরীফ খতম করেন। সাধারণ্যের পরিভাষায় একে 'শবীনা' বলা হয়। কোন কোন উলামায়ে কেরাম তো এক রাতের কোরআন খতম করাকে মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এতে করে ছহি-শুদ্ধ তেলাওয়াত এবং বুঝে-শুনে পাঠ কোনটাই সম্ভব হয় না। কিন্তু তবুও আগেকার নেক লোকদের সম্পর্কে একদিনে কোরআন খতম এমনকি একদিনে কয়েক খতম করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। তাই একাজ জায়েয হতে পারে। তবে এতে অনেক অশুভ ক্রিয়াকলাপ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ায় প্রচলিত প্রথায় 'শবিনা' খতমকে নিঃসন্দেহে মাকরূহ বলা হয়।

এক—প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকে যেভাবেই হোক রাতের ভিতরে কোরআন মজীদ খতম করার। তাই, তারতীলের প্রতিও খেয়াল থাকেনা আর ভুল-ভ্রান্তিরও কোন চিন্তা করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং পাঠক বা শ্রবণকারী নিশ্চিত ভুল হয়েছে জেনেও খতম করাটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে সে ভুল কষ্ট করে শুধরাতে যান না।

দুই—অধিকাংশ হাফিযদের মনে এই রিয়া ও আত্মগর্বের দোষ সৃষ্টি হয় যে, বেশী করে ও তাড়াতাড়ি পড়তে পারলে সুনাম হবে ; লোকে বলবে, অমুক হাফিয এক ঘন্টায় এত পারা পড়তে পারেন।' রিয়া ও আত্মগর্ব হারাম।

তিন—কোন কোন অঞ্চলে নফল নামাযে এই জাতীয় খতম হয়ে থাকে। নফল নামাযের জামাত স্বয়ং মাকরূহ। আর যদি তারাবীহর নামাযে খতম পড়া হয় তাহলে তাতে এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যে, সকল মুক্তাদি যখন জামাতে শরীক হন তখন তো হাফিয সাহেবের উপর শাস্তি হয়ে যায় আর তারা শরীক না হলে ঐ দিন আর তারাবীর জামাতই অনুষ্ঠিত হয় না। এ উভয় কাজই অত্যন্ত নিন্দনীয়।

চার—অনেকে শখের বশবর্তী হয়ে শবীনা শুরু করে পরে আর সমাপ্ত

করতে পারেন না। কিছু দাঁড়িয়ে, কিছু বসে, কিছু শুয়ে শুয়ে তেলাওয়াত করেন। এমনিভাবে একসময় কোরআন খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন। অনেকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে আলাপচারিতায় মত্ত হয়ে যায়। কোরআন শরীফের সাথে এ ধরনের আচরণ নিতান্ত বেআদবী। এ কোরআন যেন কোন তামাশার বস্তু। পড়তে পড়তে সেহরীর সময় হয়ে গেলেও খতমের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করে হাফিয সাহেবগণকে অন্যান্যদের সাথে সেহরী খাওয়ানো হয় না। সবাই খান আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শুনাতে থাকেন। কোরআন শ্রবণের সময় অন্য কাজ করা জায়েয নয়।

পাঁচ—কোন কোন হাফিয নামাযের বাইরে থেকেই ইমামের ভুলে লোকমা দেন। ইমাম সাহেব যদি মুক্তাদী নন এমন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করেন তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ছয়—কোন কোন অঞ্চলে সেহরীর জন্য চাঁদা উঠানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জোর করে বা লজ্জা চাঁদা সংগ্রহ করা হয়—যা হারাম বলে আগেই বর্ণিত হয়েছে।

সাত—কোন কোন সময় দেখা যায় সুবেহ সাদিক হয়ে গেছে অথচ কোরআন শরীফের বেশ খানিকটা তখনও পাঠের বাকী রয়ে গেছে। এমতাবস্থায়, অযথা টানা হেচড়া করে খতম পুরা করা হয়। সুবেহ সাদিকের পর ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল পড়া মাকরূহ।

পঞ্চমতঃ অধিকাংশ মসজিদে খতমের দিন শিরনী বিতরণের প্রথা চালু আছে। কোরআন খতম একটা বড় নিয়ামত এর শোকরিয়া ও খুশীতে শিরনী বিতরণ করা ভাল কাজ। কিন্তু এতে নানাধরণের অপকর্ম ঢুকে গেছে—

এক—এই প্রথার ব্যাপক প্রচলনের ফলে শিরনী বিতরণ না করলে লোকে গালমন্দ শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় শিরনী বিতরণকারীগণের নিয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খালেছ থাকে না। সামর্থ্য থাকুক, আর নাই থাকুক সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য শিরনী বিতরণ করতেই হবে। অনেক সময় ইতস্ততঃ করেও পরে মনে হয় শিরনী না দিলে লোকে কি বলবে।' রিয়া ও আত্মগর্ব করা এবং এ নিয়তে কোন কাজ করা যে গোনাহ তা ইতিপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে।

দুই—অধিকাংশ এলাকায় চাঁদা উঠিয়ে শিরনী করা হয়। মহল্লাবাসী ও নামাযীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হয়। সকলের সামনে লজ্জা দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা বা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ চাঁদা সংগ্রহে বের হওয়া ইত্যাদিও জোর-জবরদস্তির পর্যায়ে পড়ে। হাদীসে আছে,—মালিকের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মতি ব্যতিরেকে কারো সম্পদ হালাল হবে না'। কাজেই এইভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে কোন কিছু ক্রয় করা জায়েয হবে না।

তিন—এই দিন শিরনীর লোভে সর্বসাধারণ মসজিদে গিয়ে ভীড় করে। উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ ছেলে-পুলে, পাকী-নাপাকীর প্রতি বেখেয়াল বয়স্ক লোকেরা সারা মসজিদ জুড়ে হুলস্থূল কাণ্ড শুরু করে দেয়। তাদের শোরগোলে নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে।

চার—সমবেত জনতাকে শুনানের উদ্দেশ্যে খোদ হাফিয সাহেবও এইদিন ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে তেলাওয়াত করেন। রিয়া এবং রিয়ার উপকরণাদি ঘৃণিত হওয়ার কথা সবাই জানেন।

পাঁচ—শিরনী বিতরণের সময় হট্টগোল, গণ্ডগোল, গালি-গালাজ ইত্যাদি অজানা কিছু নয়। এমনিতরো আরো নানা প্রকার অশুভ ক্রিয়াকলাপ চলে এশিরনী বিতরণে। তবে,শোকরিয়া জ্ঞাপনের ইচ্ছা থাকলে প্রথা হিসাবে পালন না করে বরং সামর্থ্যানুযায়ী গোপনে যোগ্য পাত্রে দান করা উচিত।

ষষ্ঠতঃ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি বা খতমের দিন রাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাতি জ্বালানোতেও অনেক দোষণীয় দিক রয়েছে।

এক—এতে তেল ও বাতির অপচয় করা হয়। তেল ও বাতি বাবদ যে অর্থ অপব্যয় করা হয় সেই অর্থ যদি মসজিদের প্রয়োজনীয় কাজে যেমন বালতি, দড়ি, জায়নামায, বদনা ইত্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করা হতো তাহলে কত উপকার হতো। ইসরাফ বা অপব্যয়কে ইতিপূর্বেই অনেকবার হারাম বলা হয়েছে।

দুই—এই বাতি জ্বালানোতেও সুনাম কুড়াবার নিয়ত ক্রিয়া করে। লোকে বলবে, 'অমুক ব্যক্তি বাতির ব্যবস্থা করেছেন'। এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্যই অধিকাংশ লোক বাতি জ্বালিয়ে থাকে।

তিন—এই অযথা বাতি জ্বালিয়ে মসজিদকে খেলার মাঠে পরিণত করা

হয়। ইবাদতের স্থানকে খেলার স্থানে পরিণত করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ।

চার—নামাযীদের নামাযের একনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয়। বাতি কয়টা জ্বলছে, কিভাবে জ্বলছে—সেদিকে তাদের মন চলে যায়। অথচ নামাযে একনিষ্ঠতা ফরয। একনিষ্ঠতা বিনষ্টকারী যাবতীয় উপকরণই নিন্দনীয়। বিশেষ করে মুহতামিম সাহেবকে নামায টামায ছেড়ে কোন্ বাতি জ্বলছে না, কোন্‌টাকে কোথায় বসাতে হবে, কোন্‌টাতে তেল দেওয়ার দরকার ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হতে দেখা যায়।

সপ্তমতঃ—কোন কোন এলাকায় শবেকদরে লোক জমে রাত্রি জাগার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজের মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। আকস্মিক ভাবে দুই চার জন একত্রিত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। মোট কথা, এই রাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে ইবাদতে মশগুল থাকা উচিত। এই রাত উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ আয়োজনের ব্যবস্থা করা শরীয়তের পরিপন্থী কাজ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

কোন মহিলা রমযান মাসে বাড়ীতে হাফিয রেখে তার পিছনে তারাবীহ পড়ে কোরআন শরীফ শ্রবণ করে থাকেন। এটাও একটা কুসংস্কার। এতে 'মহিলাদের সম্মিলন' প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও নিম্নোক্ত অপকীর্তিসমূহ নিহিত রয়েছে ঃ—

এক—কোরআন পাঠকারী হাফিয যথাসম্ভব সুললিত কণ্ঠে ও আকর্ষণীয় সুরে তেলাওয়াত করে থাকেন। পুরুষের সুমধুর কণ্ঠ শুনে মহিলাগণের মনে কুপ্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। হাদীসে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

দুই—সালাম ফিরানোর পরপরই অসতর্ক ভাবে জোর গলায় কথাবার্তা শুরু করা মহিলাগণের স্বভাবগত। তাদের কণ্ঠ ইমাম সাহেব শুনে থাকেন। মহিলাদের পক্ষে বিনা প্রয়োজনে বেগানা পুরুষকে শুনিয়ে কথাবার্তা বলা শরীয়তে অবৈধ।

তিন—কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত সকল মহিলা হাফিয সাহেবের সম্পর্কে গায়র মুহাররম হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে হাফিয সাহেবের স্ত্রী-মা কেউ থাকেন না। একই ঘরে এতজন গায়র মুহাররম স্ত্রীলোকের মাঝে একজন পুরুষের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে শরীয়তের খেলাফ হবে। বড় কথা হলো, শরীয়ত মহিলাদেরে মসজিদে যেতে নিষেধ করে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে দূরত্ব বজায় রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্য। পুরুষের সমাবেশে মহিলার উপস্থিতি যখন নিষিদ্ধ, তখন মহিলার সমাবেশে পুরুষের উপস্থিতি এবং মহিলাগণ কর্তৃক পুরুষকে আহ্বান কর নিষিদ্ধ হবে না কেন?

মহিলাগণের পক্ষে নিজ নিজ ঘরে ব্যক্তিগত ভাবে তারাবীহর নামায পড়ে নেয়া উচিত। হ্যা, কারো ছেলে-ভাই হাফিয থাকলে, বাড়ীর আরো দু' চারজন মহিলাকে নিয়ে তার পেছনে কোরআন শ্রবণে কোন দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, হাফিয সাহেবকে ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে, মহিলাদের মধ্যে কেউ গায়র মুহাররম থাকলে মধ্যেখানে পর্দা টানাতে হবে এবং মহিলাগণ সমবেত হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

মসজিদ মাদ্রাসার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও একধরনের কুপ্রথা। লজ্জায় পড়ে, মুহতামিমের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, নিন্দাবাদের ভয়ে অথবা প্রশংসিত হবার লোভে পড়ে মসজিদ-মাদ্রাসায় চাঁদা দান করলে সে দান গ্রহণ জায়েয হবে না। বিশেষ করে এই কারণগুলো সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলে তো আর কথাই নেই। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে অনেক হাদীস বিবৃত হয়েছে। ইমাম গাযালী (রাঃ) এ বিষয়টিকে স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চাপ সৃষ্টি না করলে তো কেউ চাঁদা দিতে চায় না, অথচ কাজটি অত্যন্ত জরুরী, এমতাবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়? এটা একটা প্রশ্নই বটে।

প্রথমতঃ চাপ সৃষ্টি না করলে কেউ দান করেনা এ ধারণা ভুল। অনেক

মহানুভব খোদারবান্দা এমনও আছেন যারা ক্ষেত্র খোঁজ করে দান করেন

দ্বিতীয়তঃ যে উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করা, খোদ সে কাজটিই শরীয়তে জরুরী নয়। কেননা, অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে,অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপচয় করার জন্য এত বেশী টাকা সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে। অর্থবল কম থাকলে কাঁচা বেড়া দিয়ে মসজিদ করে নিন। দামী জায়নামাযের বদলে মাদুর বা চট বিছিয়ে দিন—এতেই নামায হবে। মাদ্রাসার জন্য ছোট ঘর নির্মাণ করুন, অথবা ঘর ভাড়া করে নিন অথবা মসজিদেই বসে পড়ুন। দ্বীনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়াদি শিক্ষাদান করুন, অল্প বেতনে শিক্ষকগণ যতদূর পড়াতে পারেন পড়ান। আসবাব-পত্রে বাড়তি খরচ পরিহার করুন।

মোট কথা, যতটুকু সংক্ষেপ করা সম্ভব করুন এবং একান্ত অপরিহার্য খাতে ব্যয় করুন। হালাল উপায়ে এতটুকু কাজও যদি করতে না পারেন তাহলে কাজের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এ কাজ তো সকল মুসলমানের, মুহতামিমের একার নয়। মসজিদ, মাদ্রাসা ইচ্ছা থাকলে চালান, নতুবা বন্ধ করে দিন। দ্বীন-পরিপন্থী উপায়ে দ্বীনের কাজ করাও খারাপ। আর যে কাজ করা আদৌ জরুরী নয়—যেমন, দুর্ভিক্ষের সময় গরীব-মিসকীন খাওয়ানো ইত্যাদি—সে কাজের জন্য চাঁদা করাতো আরো খারাপ। দেখা গেছে দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় সংগৃহীত চাঁদা গরীব-মিসকীনদের হাতে খুব খমই পৌঁছে থাকে। সেবা কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের বাড়ীতে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে এর একটা বিরাট অংশ পৌঁছে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

কোন কোন মাদ্রাসায় এইরূপ রসূম প্রচলিত আছে যে, ছাত্র কোন কিতাব পাঠ করে নিলেই তার যোগ্যতা হোক আর নাই হোক অথবা ইলম অনুযায়ী আমল সে করুক আর নাই করুক সেদিকে লক্ষ্য না করেই তাকে সম্মানের সনদ দিয়ে দেওয়া হয়। পাগড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষ্যণীয়,কাউকে পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে ওস্তাদ ও মাশায়েখগণ আসলে সাধারণ মানুষের নিকট এ কথারই ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে—'আমাদের মতে এই ব্যক্তি দ্বীনের

ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য এবং এই ব্যক্তির নিকট থেকে মাসায়েল জেনে নিয়ে আমল করা যাবে।' অর্থাৎ, আজ থেকে এই লোক অনুসরণীয় ধার্মিক ব্যক্তিত্ব। এটাই যখন পাগড়ী পরনোর আসল অর্থ, তখন অন্যান্য সাক্ষ্যের বেলায় যেসব শর্ত অপরিহার্য এর বেলায়ও সেইসব শর্ত যথাযথ প্রযোজ্য। সাক্ষ্য প্রদানের সর্ব প্রধান শর্ত হলো, সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু যে সম্পূর্ণ সত্য সে ব্যাপারে সাক্ষীকে পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে, যেন সাক্ষ্যদাতা মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা ও অন্যের ক্ষতি করার দোষে অপরাধী না হন। তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও, যাকে পাগড়ী দেওয়া হবে তিনি দ্বীনের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা রাখেন কিনা সে সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে। সমকালীন আলেমগণ যদি তার উপর আশ্বস্ত থাকেন এবং তার ইলমী ও আমলী যোগ্যতা যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে এমন ব্যক্তিকে পাগড়ী দেওয়া তো ভাল কাজ—এতে যারা তার সম্পর্কে জানে তারা তাকে জানার সুযোগ পাবে। তবে পাগড়ী পরাতে গিয়ে অযথা আড়ম্বর করে রিয়া ও ইসরাফ করা অনুচিত। ধর্মীয় বক্তাগণের উপর এই শর্তারোপ করা জরুরী যে, তারা পরীক্ষা পাশ ও আলেমগণের নিকট থেকে সনদপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে ওয়ায করতে পারবেন না এবং সাধারণ মানুষকেও বলে দিতে হবে, তারা যেন সনদ পরীক্ষা না করে কোন অপরিচিত বক্তার ওয়ায না শুনেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে বলে মনে করি। সনদ প্রদান ও দস্তারবন্দীর এটাই রহস্য, এটাই হিকমত। অযোগ্য পাত্রে সনদ প্রদান করলে ও পাগড়ী পরালে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কোন ফল পাওয়া যাবে না।

নবম অনুচ্ছেদ

পীর-আওলিয়াগণের ব্যবহৃত বিশেষ দ্রব্যাদি দেখার উদ্দেশ্য কোথাও গমন করাও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এসব বস্তু দেখার জন্য সাধারণ লোকেরাই বেশী গিয়ে থাকে। তারা এ কাজকে 'তাবাররুক যিয়ারত' বলে থাকে। তাবাররুক যিয়ারত করতে গিয়ে নিম্নোক্ত অসাবধানতাসমূহ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

এক—কোন কোন স্থানে তাবাররুক নামে পরিচিত বস্তুসমূহ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অবাস্তব কিছুকে হুয্‌র (সাঃ)–এর সাথে জুড়ে দেওয়া জঘন্য অপরাধ। তেমনিভাবে আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সম্পর্কে মনগড়া উক্তি করা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা। এমনকি কোন কোন তাবাররুক অমূলক হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি ও কিতাবাদির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কদম শরীফের ঘটনাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম বানোয়াট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে যেক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী প্রমাণ পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে আমরা কোন তাবাররুককে মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে যখন আনুষঙ্গিক কারণসমূহের দ্বারা ইহা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার মতো কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তখন একে তাবাররুক বলে ধারণা চলে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না। কারণ নিশ্চিত হওয়ার প্রমাণাদি এখানে অনুপস্থিত।

দুই—অনেকে নিজে না গিয়ে অন্যকে পারিশ্রমিক দিয়ে তাবাররুক যিয়ারত করিয়ে নেয়। যিয়ারত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে ফেকাহর কিতাবসমূহে হারাম ও ঘুষ বলা হয়েছে।

তিন—যিয়ারতের সময় অনেক নারী–পুরুষ একত্রিত হওয়ার ফলে অসাবধানতাবশতঃ একে অপরের গায়ে হাত দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বেশী মানুষের ভীড় হলে গায়ে গায়ে লাগবেই।

চার—তাবাররুক যিয়ারতের প্রচারের সীমা ফরয–ওয়াজিবকেও ছাড়িয়ে যায় অনেক সময়। যে ব্যক্তি এ যিয়ারতে অংশগ্রহণ করে না তাকে অনেক কটু কথা সহ্য করতে হয়। তাবাররুক যিয়ারতকে এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করা নিঃসন্দেহে সীমালংঘন। তাই তাবাররুক যিয়ারতের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, ঘটা করে না গিয়ে বরং একা একা সকলের অজান্তে যাওয়া এবং রুসূম পালন না করে এমনিতেই যিয়ারত করে আসা। ঐ সকল তাবাররুকের খাদিমকে তার খেদমতের জন্য অনির্দিষ্টভাবে মাঝে মধ্যে কিছু দান করলে দোষ নেই।

দশম অনুচ্ছেদ

মসজিদকে সীমাতিরিক্ত কারুকার্য খচিত ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করাও এক ধরনের কুসংস্কার। ফেকাহবিদগণ বলেছেন এবং বিবেকও তো বলে, মসজিদের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যয় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মসজিদকে অযথা অলংকৃত করা মাকরূহ। এমনকি, এজন্য যদি ওয়াকফের সম্পত্তি খরচ করা হয় তাহলে মুতাওয়াল্লি তা নিজের পকেট থেকে পরিশোধ করবেন। সত্যি, সামান্য চিন্তা করলে দেখা যায়, মসজিদ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য হলো—এতে এবাদত করা। আর ইবাদতের প্রাণহলো একাগ্রতা ও ভীতি। অতএব, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, যে জিনিষ একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাবে তা ইবাদতেরও বিঘ্ন ঘটাবে এবং তা মসজিদ নির্মাণের আসল উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। কাজেই এমন জিনিষ মসজিদে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীর মিস্ত্রীকে অতিরিক্ত রং করতে নিষেধ করেছিলেন। এর কারণ স্বরূপ বলেছিলেন, 'এতে করে নামাযীদের মন সেই কারুকার্যের দিকে আকর্ষিত হবে, এভাবে ইবাদতের ঘর খেল–তামাশার ঘরে পরিণত হয়ে যাবে।' আবুদাউদে বর্ণিত এক হাদীসে এ ধরনের কারুকার্য খচিত ও অলংকৃত করাকে ইহুদী–খৃষ্টানের কাজ বলা হয়েছে। ইহুদী–খৃষ্টানের অনুকরণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।এতে অপব্যয়ও হয়। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহংকার ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়। এই কাজ করার জন্য হালাল অর্থ খুব কমই সংগৃহীত হয়।কেননা, এই ধরনের প্রয়োজনীয় কাজে হালাল সম্পদ ব্যয় করতে মনে বাঁধে। হারাম অর্থ মসজিদের কাজে লাগানো জঘন্য পাপ।

মসজিদকে অতিরিক্ত সাজ–সজ্জা করাতে যখন এসব অপকারিতা নিহিত, তখন একে পরিহার করে, মজবুত সাধাসিধা ধরনের কাজ করাই উত্তম। মসজিদে খরচ করার ইচ্ছা থাকলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে দেওয়া যায় অথবা মসজিদের বিভিন্ন কাজে ব্যয়ের জন্য দোকান ইত্যাদি কিনে ওয়াকফ করে দেওয়া যায়।

কেউ কেউ বলেন, 'হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ

কালে সাজ–সজ্জা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা আরো যুক্তি দেখান, ধর্মের শান–শওকত প্রকাশের জন্য মসজিদে কারুকার্য করা উচিত।' তাদের এসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হযরত উসমান (রাঃ) অতিরিক্ত সাজ–সজ্জার কথা বলেননি, তাঁর নিয়তে অহংকারও ছিল না, তিনি সন্দেহযুক্ত অর্থও একাজে ব্যয় করেননি, সর্বোপরি তাঁর কাজের উপর বর্তমান যমানার কাজকে ক্বিয়াস করাও অযৌক্তিক। তাছাড়া এ জাতীয় কাজে দ্বীনের শান–শওকত প্রকাশ পায় না বরং সাধাসিধাভাবে মসজিদ তৈরী করলেই দ্বীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ, বিশেষ করে রেষারেষি ও অহংকার করে এমন কাজ করা দ্বীন ও বিবেকের পরিপন্থী কাজ। মোদ্দাকথা হচ্ছে, দ্বীনের কাজ দ্বীনের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে করতে হবে নতুবা সওয়াব তো পাওয়া যাবেই না বরং গোনাহ হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

কেহ মারা যাবার পর সেখানে উপস্থিত উত্তরাধিকারীগণ মৃতের কাপড়–চোপড় বের করে গরীব ও অভাবীদেরকে বিতরণ করা শুরু করেন, মসজিদ মাদ্রাসায় দিয়ে দেন। এটাও একটা কুপ্রথা। তাদের খেয়াল থাকে না যে, মৃতের সম্পদে অনুপস্থিত উত্তরাধিকারীগণেরও অংশ রয়েছে। তারা হয়তো এ বিলিবন্টনকে পছন্দ করবে না অথবা তারা অন্যকে দিতে চাইবে। তেমনিভাবে কোন কোন ওয়ারিস অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকলে তাদের অংশ খরচ করা জায়েয হবে না। এমনকি তারা যদি অনুমতি দেয় তবুও নয়। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্কের চুক্তি, দান ইত্যাদি শরীয়ত মত গ্রহণযোগ্য নয়।

মুর্দাকে ঢেকে রাখার চাদর ও নীচে দেওয়ার জায়নামায কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এইগুলিও মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে খরচ করে কেনার রেওয়াজ রয়েছে। এতে করে পরধন আত্মসাৎ ও যুলুম করার গোনাহ হয় বিধায় একাজ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

কেউ যদি মৃত্যুর পর তার কাপড়–চোপড় গরীব অথবা সৎলোকদেরে দিয়ে দেবার অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলে পরিত্যাক্ত মোট সম্পদের এক–তৃতীয়াংশ বা তার কম হয় তাহলে তা দান করার জন্য অন্য ওয়ারিসগণের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। তবে ওয়ারিসকৃত বস্তুর পরিমাণ এক–তৃতীয়াংশের বেশী হলে প্রথমে ওয়ারিসগণের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে নিতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পাওয়ার পর এখন নিজের স্বত্ব থেকে যাকে ইচ্ছা দান করতে পারবেন। নাবালেগের প্রাপ্ত অংশ তার কাজে লাগলে রেখে দিতে হবে, নতুবা বিক্রি করে বিক্রয় লব্ধ অর্থ

তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করা যাবে।

সকল ওয়ারিস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং প্রকাশ্য অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে ভাগ-বাটোয়ারা করার আগেই দান করা যাবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না, তাই দান গ্রহীতারও কর্তব্য বুঝে শুনে দান গ্রহণ করা, মুর্দার সম্পদকে গনীমতের মাল মনে করে অচিন্তনীয়ভাবে গ্রহণ করা মোটেও উচিত নয়। মসজিদ-মাদ্রাসার হর্তা-কর্তাগণ এ ব্যাপারে সচেতন হলে সাধারণ মানুষও সতর্ক হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কোন পীর বা শেখের মৃত্যু হলে শিষ্য অনুরক্তগণ মিলে তাঁর কোন ছেলে অথবা কোন খাদেমকে সাজ্জাদানশীন অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত করে তাকে পাগড়ী পরিয়ে দেন—এ প্রথাও একটা কুসংস্কার। যাকে স্থলাভিষিক্ত করা হল তার সে যোগ্যতা আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য দেয়া হয় না। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, যারা এখন পর্যন্ত তরিকত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পীরের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের কি অধিকার আছে? —তাদের সম্মতি-অসম্মতিতে কি আসে যায়? স্মর্তব্য যে, সাজ্জাদানশীন নির্ধারণকারী কমিটির সদস্যগণ, তাদের নির্ধারিত সাজ্জাদানশীনের কাছে বায়াত গ্রহণ করে যতলোক বিভ্রান্ত হবে তাদের সকলের পাপের সমভাগী হবেন। কমিটির সদস্যগণই তো এই বিভ্রান্তির মূল উদ্যোক্তা। হাদীস শরীফে কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে—'মানুষ অজ্ঞ লোকদের নেতা বানাবে ; তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে, এবং অন্যদেরেও বিভ্রান্ত করবে।' কাজেই সমকালীন নেককারদের কাছে যিনি নির্ভেজাল শরীয়ত ও তরিকতের অনুসারী বলে পরিচিত সেই শায়খের নিকট থেকে অনুমতি না নিয়ে কারো পক্ষে বায়াত গ্রহণ করা অনুচিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কারো মৃত্যুর পর তার ছেলেমেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ লাভ করে, পরিবারের বর্তমান কর্তা সেই ছেলেমেয়ের বিয়েতে তার প্রাপ্ত অংশ খরচ করে নিঃশেষ করে দেন আর মনে মনে ভাবেন ; আমি তো তার সম্পদ তার নিজের কাজেই ব্যয় করলাম, এতে গোনাহ হবে কেন?'—এও একটা কুপ্রথা।

এ কাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কোন রংবাজ মেযবান মেহমানকে দাওয়াত দিয়ে এনে খোদ মেহমানেরই জুতা বিক্রির পয়সা দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করিয়ে বললো 'এ খাদ্যবস্তু আপনারই জুতার দান'। অনেক সময় দেখা যায়, বিয়ের খরচ করতে গিয়ে কিছু টাকা ধার নেওয়া হলে তা পরিশোধ করার দায়িত্বও ঐ ছেলে বা মেয়ের উপর পড়ে। এ কি সুস্পষ্ট যুলুম নয়!

অনাবশ্যক প্রথা পালন এমনিতেই তো নাজায়েয। তদুপরি প্রাপ্ত বয়স্ক মালিকের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তার ব্যক্তিগত সম্পদ বৈধ খাতে ব্যয় করাও নাজায়েয আর মালিক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তাহলে প্রকাশ্য অনুমতি প্রদান করলেও তা শরীয়তমত গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্য কথায় প্রচলিত পদ্ধতিতে মালিক সম্মত আছেন বলে ধরে নেওয়া মোটেও জায়েয নয়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মেয়ে-বোনকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রথা অকাট্য প্রমাণ অর্থাৎ কোরানিক নির্দেশের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। কোরআন শরীফের সূরা নিসায় আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,—'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে, স্ত্রীলোকদের তেমনি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার রয়েছে। চাই সে সম্পত্তি বেশীই হোক অথবা কম। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং অবশ্য পালনীয়' এই স্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করার স্পর্ধা দেখানো সত্যিই জঘন্য।

কেউ কেউ বলে থাকেন, “হুযূর, মেয়ে–বোনেরা তো স্বেচ্ছায়ই নেয় না।” তাদেরে প্রশ্ন করা দরকার, আচ্ছা, আপনারা কি কখনও দিয়ে দেখেছিলেন? তারা কি তখন নিতে অস্বীকার করেছে?’ তারা হয়ত লজ্জায়–শরমে চাইতে পারেনি। এভাবে কেউ যদি লজ্জায় পড়ে নিজের হক পরিত্যাগ করে তাহলে তা অন্যের জন্য হালাল হয়ে যায় না। অনেকে বলেন, ‘আমরা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারা নেয়নি।’ এ অজুহাতও অযৌক্তিক। লোকের নিন্দাবাদের ভয়ে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তা শরীয়তসম্মত হবে না। আর যদি মহানুভবতা দেখিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করুন তা হালাল হবে কি না। বর্তমানের অধিকাংশ লোকজন অভাবী ও নিঃসম্বল এবং সম্পদের মোহ সবার মধ্যেই রয়েছে। এমতাবস্থায় কেবল প্রথাগত সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কারো মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণের তালিকা প্রণয়ন করা কর্তব্য এবং যাবতীয় সম্পদ হিসাব করে প্রত্যেকের অংশ জোর করে প্রদান করা উচিত। কেউ যদি প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে গোপনে তার পুরাপুরি অংশ দেওয়া উচিত। কেউ যদি তৎক্ষণাৎ সামলাতে না পারে তাহলে অন্য কেউ আপাততঃ তার অংশ হেফাযত করতে পারে।

অনেকে এই ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন যে, মেয়ে–বোনকে বিভিন্ন পর্ব–অনুষ্ঠানাদিতে উপহার ইত্যাদি দিয়ে দিলেই তো তাদের পাওনা চুকে যায়। এর জবাবে তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত রংবাজের কাহিনীটি স্মরণ করাই যথেষ্ট।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মসজিদের জিনিষ–পত্র নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়াও একটি কুপ্রথা। অনেকে মসজিদের বাতি দিয়ে আগুন, পানপাত্র দিয়ে পানি, মসজিদের বদনায় রোগীর জন্য পানি পড়া, নিজের বাড়ীতে মেহমানদেরে বসানোর জন্য মসজিদের সতরঞ্জি, বাড়ীতে ইস্তেঞ্জা করার জন্য মসজিদের ঢিলা–কুলুখ ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, মসজিদের মাল তো ওয়াকফ সম্পত্তি, এ থেকে সকলের উপকার লাভের অধিকার রয়েছে।

এ কথাটিই তো নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ। কেননা, ওয়াকফের হুকুম হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে, যে শর্ত সাপেক্ষে ওয়াকফ করা হয় সেই শর্ত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্যত্র এর ব্যবহার জায়েয নয়। উপরোক্ত জিনিষগুলো যে উল্লেখিত কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়নি তা সকলেই জানেন। নামাযের সময় নামাযীদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য এগুলি ওয়াকফ করা হয়েছে। এই কারণেই নির্ধারিত শর্ত ও উদ্দেশ্যের বাইরে এসব ওয়াকফকৃত সম্পদের ব্যবহার হারাম হবে।

ফেকাহবিদগণ বলেছেন, যে পানি পান করার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে সে পানি দিয়ে অজু করা জায়েয হবে না। ওয়াকফের অর্থ যদি এই হয় যে, সবাই একে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তো মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত ইট দিয়ে নিজের বাড়ী তৈরী করা এবং মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত কাঠ দিয়ে নিজের ঘরের দরজা–জানালা তৈরী করা জায়েয হওয়ার কথা। নাঊযুবিল্লাহ। অনেকে মসজিদকে হলঘর বা বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করে বাড়ীতে বেশী মেহমান আসলে সেখানেই তাদেরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। মসজিদ এই কাজের জন্য নয় বিধায় একাজ জায়েয হবে না।

এমনকি ফেকাহবিদগণ এও বলেছেন যে, যারা বেতন নিয়ে কোরআন ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, ছাত্রদেরে নিয়ে মসজিদের ভিতর পড়ানো তাদের পক্ষে জায়েয নয়। কেননা মসজিদ ইবাদতের ঘর, ব্যবসার ঘর নয়। মসজিদের আদব রক্ষার্থে দুর্গন্ধযুক্ত কিছু মসজিদে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এমনকি মসজিদের ভিতর মাটিয়া তৈল জ্বালানো এবং ম্যাচ ঠুকা ইত্যাদিও পরিহার করা উচিত। বাইরে থেকে বাতি জ্বালিয়ে মসজিদের ভিতর যাওয়া উচিত। ধূমপায়ী ব্যক্তির মুখের দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা অনুচিত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

কোন কোন এলাকায় ঈদের নামায, এমনকি কোথাও কোথাও জুমআ ও পাঁচওয়াক্তিয়া নামাযে ইমামতি করাকে বংশগত উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটাও একপ্রকার কুপ্রথা। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইমামের যোগ্যতা আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম শুদ্ধ করে কোরআন পাঠ করতেও অক্ষম হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় সকলের নামায নষ্ট হবে। আর ইমাম সাহেব সহী-শুদ্ধ করে কোরআন পাঠ করতে পারলেও মুক্তাদীগণ যদি তার ইমামতিতে নারাজ হন এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশংকায় তারা তার প্রকাশ না করেন, তাহলে এই ইমামের শক্ত গোনাহ হবে। হাদীসে এসেছে, এই ধরনের ইমামের নামায কবুল হবে না।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

অনেকে ঈদ, জুমআ বা অন্যান্য নামাযে ভালো জায়গা সংরক্ষণের জন্য নিজের জায়নামায, তসবীহ ইত্যাদি দিয়ে চাকর-বাকরকে আগে-ভাগেই সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে সময় মত গিয়ে উপস্থিত হন। এই প্রথাও সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আরয করেছিলেন, আমরা কি আগে ভাগে মিনায় গিয়ে আপনার জন্য তাবু প্রস্তুত করে রাখবো?' হুযূর (সাঃ) বলেছিলেন 'না' বরং যে প্রথমে সেখানে পৌছবে সেই সেখানে অবস্থান করার অধিকারী।' তবে কেউ যদি কোন জায়গায় বসে এবং নামাযও সেখানেই আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনে যেমন, অযু নবায়ন বা কফ ফেলা ইত্যাদি, যদি তাকে সেই জায়গা সাময়িক ভাবে ত্যাগ করতে হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এখানে বসার অধিকারী। অন্য কারো পক্ষে সেখানে বসা জায়েয হবে না। এই প্রসঙ্গেও একটি হাদীস রয়েছে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

অধিকাংশ মসজিদে ইমাম সাহেবের দাঁড়াবার জায়গা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ও উঁচু হয়ে থাকে। এমনকি কোন কোন মসজিদে ইমাম সাহেব মেহরাবের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সমস্তও কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। ফেকাবিদগণ এ উভয় অবস্থাকে মাকরূহ বলেছেন। কাজেই ইমাম সাহেবের দাঁড়াবার জায়গা যাতে উঁচু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত এবং ইমাম সাহেবের পা অন্ততঃ মেহরাবের বাইরে রাখা উচিত।

নবম অনুচ্ছেদ

এটাও একটা কুপ্রথা যে, দু'এক খানা ছোট-খাট ডাক্তারী বই-পত্র পাঠ করেই অনেক লোক ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করে দেয়। এসব লোক যে চিকিৎসা বিদ্যায় বিস্তারিত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা তো বলাই বাহুল্য, এমনকি ছোট খাট চিকিৎসা করার সাধারণ জ্ঞানও তাদের মধ্যে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। হাদীসে আছে,—'চিকিৎসা বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কারো চিকিৎসা করে এবং এর ফলে রোগীর ক্ষতি হয়, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং পরকালেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। উর্দু ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,—'নিম হাকীম খতরায়ে জান, নিম মুল্লা খতরায়ে ঈমান।' অর্থাৎ—আনাড়ী ডাক্তারের চিকিৎসায় প্রাণনাশের আশংকা আর আনাড়ী মুল্লার কথা শুনলে ঈমান নাশের আশংকা।

দশম অনুচ্ছেদ

কুরবানীর জন্তুর পা গোশত কর্তনকারীকে এবং মাথা জবাইকারীকে দেওয়ার রীতিও এক প্রকার রসূম। তেমনিভাবে আক্বীকাতেও তাদের হক্ব দেওয়া হয়। এ কাজকে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই অবশ্য পালনীয় মনে করে। তা পালন না করলে অনেক লোকের নিন্দাবাদ শুনতে হয়। এমনকি মাঝে-মধ্যে তারা মালিকের বিনা অনুমতিতেই তা নিয়ে যায়। শরীয়তে একাজ

আবশ্যক হওয়ার কোন দলীল নেই। চিন্তা করলে দেখা যাবে এ কাজের ফলে অনেক বড় বড় খারাবী দেখা দেয়। ফেকাহ্‌র মুলনীতি অনুযায়ী; কোন কাজ অত্যধিক প্রচলিত হয়ে গেলে, তা বিনা শর্তারোপেই শর্তারোপের মত হয়ে যায়। কারো সাথে যদি এ শর্তাধীনে চুক্তি করা হয় যে, ‘তুমি আমার অমুক কাজ করলে আমি তোমাকে এই বিনিময় দেবো ; তাহলে সেই বিনিময় পারিশ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে। আর পারিশ্রমিক শ্রম গ্রহীতার দায়িত্বে ঋণ স্বরূপ। অতএব, এক্ষেত্রে কুরবানীর জন্তুর অংশ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে, এটাও তো একপ্রকার বিক্রি। একাজ সুস্পষ্ট হারাম। কোরবানীর জন্তুর সামান্যতম অংশও বিক্রি করা যাবে না, কেবল দান করা যাবে। তেমনিভাবে কুরবানীর চামড়ায় মসজিদের মুয়াজ্জিনের হক রয়েছে বলে মনে করাও দোষণীয়। এই সমস্ত রুসূম পালন চিরতরে বন্ধ হওয়া উচিত। অনির্ধারিতভাবে, কোন প্রকার অমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে মালিক যাকে ইচ্ছা কুরবানীর অংশ বিশেষ দান করতে পারে।

কোন কোন অঞ্চলে গরু–মহিষের বাচ্চা প্রতিপালনের পারিশ্রমিক স্বরূপ ঐ বাচ্চার একাংশ প্রদান করার রেওয়াজ রয়েছে। যেমন, যায়েদ তার গরুর বাছুর আমরের কাছে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এই শর্তে প্রদান করলো যে, বাছুরটি বড় হলে অর্ধেকটা তার নিজের হবে এবং অর্ধেকটা আমরকে দিয়ে দেবে। এই অর্ধাংশই আমরের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় বাছুরটি বড় হলে পর কখনো যায়েদ পূরা বাছুর রেখে দিয়ে আমরকে তার অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেয়, আর কখনো আমর পূরা বাছুর রেখে দিয়ে যায়েদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেয়। এই জাতীয় শর্ত সাপেক্ষে কোন চুক্তি শরীয়তমত বৈধ নয়। প্রতিপালনকারী যদি গরু রেখে দেয় তাহলে তা হালাল হবে না। এইভাবে গরুর মালিক হয়ে সে গরু কুরবানী দেওয়াও বৈধ হবে না।